ASSOCIATION OF IMAM MAHDI (A.S.)
AIM
MUMBAI

MRP Rs.15/-

আল-ক্বায়েম
আল-মুন্তাযার

বিশেষ সংখ্যা

(বাংলা সংস্করণ, মুহার্রম ১৪৪৫ হিজরী)

মহানবী হযরত মোহাম্মাদ (সঃ) বলেছেন:

জেনে রেখো! ইমাম হোসায়েন (আঃ)-এর প্রতি ক্রন্দনকারীর উপরে আল্লাহ রহমত ও দয়াসহ দরূদ প্রেরণ করেন।

দ্রষ্টব্য: বেহারুল আনওয়ার, খঃ ৪৪, পৃঃ ৩০৪।

আল-ক্বায়েম

আল-মুন্তাযার

(বাংলা সংস্করণ)

আযাদারী বিষয়ক সাময়িকী

মহরম সংখ্যা ১৪৪৫ হিজরী

বিষয়সূচি

১- জীবন শৈলী
২- আযাদারী হলো সাহাবায়ে কেরামদের সীরাত
৩- ইমাম হোসায়েন (আঃ)-এর তাঁর যিয়ারতকারীদের উপরে বিশেষ অনুগ্রহ
৪- নাজাতের বিন্দু
৫- 'আর্বাঈনে' (চল্লিশায়) গ্র্যান্ড মুফতি আয়াতুল্লাহ সিস্তানী সাহেবের বার্তা

Published by:

Syed Mohd. Akbar Rizvi on behalf of Association of Imam Mahdi (A.S.), Published from 97/C, Bazar Road, Bandra (W), 400050

بسم الله الرحمن الرحيم
পরম করুণাময় আল্লাহর নামে
السلام عليک يا امير المؤمنين السلام عليک يا اول مظلوم
صلى الله عليک يا ولى العصر ادركنا و ارشدنا
আপনার উপর শান্তি বর্ষিত হোক হে আমীরুল মোমেনীন! হে প্রথম মজলুম!
আর সালাম ও শান্তি বর্ষিত হোক হে যুগের অভিভাবক।
আপনি আমাদের হেদায়েত করুন এবং সাহায্য করুন।

জীবন শৈলী

মানবজাতির সৃষ্টি অর্থাৎ হযরত আদম (আঃ) থেকে শুরু করে হযরত মোহাম্মাদ মুস্তফা (সঃ) পর্যন্ত সকল নবী-রসূলগণের জীবনধারা একই রকম ছিল। মানুষকে ঐশ্বরিক বিধি-বিধান অনুযায়ী জীবনযাপন করানোর প্রকৃত ও সত্য পথ-প্রদর্শকগণকে পৃথিবীতে পাঠানো হয়েছে। এই জীবনধারা সর্বদাই কল্যাণ, দয়া, সহানুভূতি, ভালবাসা, সাম্য, ন্যায়পরায়ণ জীবন যাপন, অত্যাচার পরিহার, নিপীড়িতকে সাহায্য করা, আল্লাহর এবাদতে সময় কাটানো, হালাল রিজিক উপার্জন এবং এরূপ অন্যান্য সকল পুণ্যের দাওয়াত দিতে থাকে। এ কারণেই মহান আল্লাহ তায়ালা মানব জীবনের উদ্দেশ্যে যে জীবন বিধান কুরআনের আয়াতে বর্ণনা করেছেন সেই একই বিধান তিনি তৌরাত, যবূর ও ইঞ্জীলেও ব্যক্ত করেছিলেন। আর জীবন শৈলী হল: وَمَا خَلَقتُ الجِنَّ وَ الاِنسَ الاّ لِيَعبُدُونَ. আমি জ্বীন ও মানুষকে কেবলমাত্র আমার এবাদত (আদেশের দাসত্ব) করার জন্য সৃষ্টি করেছি।[1]

তিনি নবী-রসূলগণকে একটি উন্নত সমাজের ভিত্তি স্থাপনের জন্য প্রেরণ করেছেন, কিন্তু পৃথিবীর শুরু থেকে সময় অতিবাহিত হওয়ার সাথে সাথে তাগুতী প্রভাবের সমস্ত উপাদান জেগে ওঠে এবং তা এই সকল কল্যাণকর গুণ ও বৈশিষ্টের সামনে প্রতিদ্বন্দ্বি হয়ে দাঁড়ায়। তারা সম্মুখভাগে এসে দৃশ্যতই নবীজির দেওয়া নির্দেশ পালনের বিরোধিতা করে।

অপব্যবহার, যুদ্ধ-বিগ্রহ, খুন-খারাবী, লুঠতরাজ, হত্যা, অসহায় ও নিরুপায় মানুষদের এবং এতীমদের মুখের আহার ছিনিয়ে নেওয়া, জনসাধারণকে নিষ্পেষণ করে, রাজত্ব হাসিল করার জন্য মিথ্যাচার করা, মিথ্যার সাথে সাথে নিত্য-নতুন প্রচারণার উদ্ভাবন, অনুরূপ মিথ্যাকে ধমনির রক্তের সাথে মিশ্রিত করার অপচেষ্টার কোনো ত্রুটি করেনি। যেমন ইবনে মাজা লিখেছেন যে, নবীপাক (সঃ)-এর জানাযায় সবাই উপস্থিত হয়েছিলেন, অমুক ছিলেন অমুক ছিলেন এবং আলীও ছিলেন। আর লিখেছেন তাঁদের মধ্যে কেউ বলেছেন: ইয়া রসূলুল্লাহ! আমি আপনার বিচ্ছেদে এতো কাঁদতাম যে, চোখের পানি দ্বারা আপনার জানাযার গোসল দিতাম, কিন্তু কি করবো, আপনি কাঁদতে নিষেধ করেছেন, কান্না গুনাহর কাজ তাই আমি কাঁদতে পারছি না। এই কথা একজন আইনজ্ঞ ও অনেক বড় মাপের প্রণেতা ইবনে মাজা লিখছেন। তাহলে এই কথা কি সত্য? আর যদি এটি সত্য না হয় তবে এতো বড় মাপের ও বিবেকবান লেখক কিভাবে এই রেওয়ায়েত বর্ণনা করলেন? কোন আবেগে ভেসে গিয়ে লিখলেন? এটা কি অর্থ-সম্পদ জড় করার লক্ষ্যে, নাকি সেই সকল মানুষের পক্ষ থেকে এক ষড়যন্ত্র ছিল যারা হযরত আলী (আঃ)-এর বিরোধি শিবিরে অবস্থান করছিল। আর আলী (আঃ)-কে আঁধারের রাখার ব্যর্থ চেষ্টা ছিল?

শুধু তাই নয় সীরাতে মোস্তফা (সঃ)-এর মধ্যে একটা রেওয়ায়েত বর্ণিত হয়েছে যে, নবীপাক (সঃ)

---

[1] *সূরা: যারিয়াত, আঃ ৫৬।*

তাঁর কনিষ্ঠা কন্যাকে ডেকে বললেন: আল্লাহ তায়ালা তোমাকে অনেক বড় নেয়াতম দান করেছেন, আর তা হলো তসবীহে ফাতেমা। এই কনিষ্ঠা কন্যা বলা এক ডাহা মিথ্যা, কারণ তাঁর একটিমাত্র কন্যা ছিল। কিন্তু অর্থ-সম্পদের লালসা রসূল (সঃ)-এর পবিত্র বংশধরকে পর্দার অন্তরালে রেখে দিল, আর তাঁদের মান-মর্যাদা ও উচ্চস্থানকে ছোট করে দেখানোর জন্য এই চিত্র পেশ করলো যে, নবীপাকের চার চারটি বেটি ছিল, যার মধ্যে দু দুটিকে উসমান গনীর সাথে বিবাহ দিয়েছিলেন যে কারণে তাঁর উপাধি হয়েছিল উসমান যুন-নূরাইন। কিন্তু তার পরেও তাদের এই কল্পিত কন্যাকে হযরত ফাতেমা যাহরার মর্যাদার সামনে দাঁড় করাতেই পারে নি।

এই ভ্রান্ত চিন্তাধারা কিভাবে মানুষের মগজে ঢোকানে হয়েছে?

নবা পাক (সঃ)-এর সীরাতের উপরে লিখিত সকল গ্রন্থে লেখা হয়েছে যে, যখন নবীপাক (সঃ)-এর ইন্তেক্কাল হলো তখন হযরত উমর নগ্ন তরবারি নিয়ে মদীনার অলি-গলিতে হাঁটতে লাগলেন এবং বলতে লাগলেন যে, কেউ যেন বলে না যে, নবীর ইন্তেক্কাল হয়েছে। এই ঘটনা সম্পর্কে একজন সুন্নী আলিমকে জিজ্ঞাসা করলে বললেন: হযরত মোহাম্মাদ মোস্তফা (সঃ) যদি নবী না হতেন তবে হযরত উমর নবী হয়ে যেতেন। এই তুলনা করার প্রতি লক্ষ্য রেখে এই বাক্যটি নিয়েও চিন্তা করুন যে, উমর নগ্ন তরবারি নিয়ে এক মিথ্যা কথা প্রচার করছেন, আর তার উপরে সুন্নী ভাইরা এই অজুহাত পেশ করছেন যে, হযরত উমর একজন অত্যন্ত গম্ভীর মানুষ ছিলেন। বুঝে আসে না যে, অন্য ধর্মের কেউ যদি এই ঘটনা দেখে তবে বলবে যে, ওহুদ যুদ্ধে যদি হযরত রসূল (সঃ)-এর স্থানে হযরত উমর হতেন তবে সেই ময়দানেই ইসলাম দাফন হয়ে যেতো।

আম্বিয়াগণের পরীক্ষার জন্য খান্নাসের সাংঙ্গ-পাঙ্গ যারা আসলে মানুষ ও জিনদেরই সন্তান, আম্বিয়াগণের সামনে সারিবদ্ধ হয়ে দাঁড়িয়েছে। এমনকি হযরত মরিয়ম (আঃ)-এর সামনেও পুরো সমাজ তাঁর বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়িয়েছে যে, বলো! এই শিশু সন্তান কার? তখন হযরত ঈসা (আঃ) বিবি মরিয়ম (আঃ)-এর সতীত্বের সাক্ষ্য দিলেন এবং তাঁর সতীত্ব এতো সুদৃঢ়ভাবে প্রমাণিত হয়ে গেলো যে, তা এক দৃষ্টান্ত হয়ে থেকে গেলো, আল্লাহ্ যা চায় তাই করে।

মিথ্যুক সমাজে এসে নবুয়্যত ও এলাহী আহকামের বিরুদ্ধে পূর্ণ শক্তি সহকারে রুখে দাঁড়ায় এলাহী আইন ও বিধানকে বিলুপ্ত করে দেওয়ার জন্য। এই পরম্পরা সুদীর্ঘকাল থেকে চলে আসছিল। আর এক পার্যায়ে তা মহানবী (সঃ) পর্যন্ত এসে পৌঁছায় এবং তিনি বলেন: সকল আম্বিয়া ও মোরসালীনগণ যে মুসীবত ও কষ্ট সহ্য করেছেন এই দ্বীন প্রতিষ্ঠা করার জন্য আমি একা তার থেকে বেশি মুসীবত ও কষ্ট সহ্য করেছি। তার কারণ হলো যত মিথ্যুক, ফেৎনাবাজ, মোনাফিক্ব, অত্যাচারী, অনাচারী ও কাফির তাঁর সময়ে আত্মপ্রকাশ করেছিল সম্ভবতঃ অন্য কোনো নবীর সময় একত্রে এতো বেশি শত্রু সামনে আসেনি ও তাদের মোকাবেলা করতে হয় নি। এই গোষ্ঠীগুলোর প্রত্যেকের বিরুদ্ধে আয়াত অবতীর্ণ হয়েছে।

আসুন আমরা হযরত ইমাম হোসায়েন (আঃ)-এর শাহাদতের পূর্বের কারবালা অবধি অবস্থা নবীপাক (সঃ)-এর পবিত্র জীবনের এক ঝলক সামনে রেখে সমীক্ষা করার চেষ্টা করি এবং মানুষের জীবন ধারণের এক ছোট বিশ্লেষণ করার চেষ্টা করি এবং বোঝার চেষ্টা করি যে, কারবালার ঘটনা কত বড়ো মর্মান্তিক ঘটনা ছিল, আর আল্লাহ্ তার বিনিময়ে কী কী ফযীলত দান করেছেন।

মক্কার লোকেরা এতটাই অজ্ঞ ও নির্বোধ ছিল যে, তারা খেজুরের মূর্তি তৈরি করতো এবং খিদে পেলে তা খেয়ে ফেলতো, অর্থাৎ তারা তাদের ঈশ্বরকেও খেয়ে নিতো, আর সে সময় পৌত্তলিকতা চরমে পৌঁছে গিয়েছিলো। এ পরিবেশে কোনো ব্যবসায়ী তাদের এলাকায় ঢুকলে তারা উটসহ অদৃশ্য হয়ে যেতো বা তার সম্পদ লুট করে নিতো। আল্লাহর রসূল (সঃ) এমন একটি প্রতিষ্ঠান প্রতিষ্ঠা করেছিলেন যেখানে এই সমস্ত গর্হিত কাজগুলো রহিত করা হয়েছিল। আর এই সিদ্ধান্ত নেওয়া

হয়েছিল যে, যে ব্যক্তি কোন ব্যবসায়ী বা বিদেশীর সম্পত্তি ও উট চুরি করবে তাকে শাস্তি দেওয়া হবে। এক দিকে বিয়াল্লিশ বছর যাবৎ মানুষ নবীপাক (সঃ)-এর নিকট আমানত গচ্ছিত রাখতো এবং সেই আমানতে খেয়ানত বা বিশ্বাসঘাতকতা তো দূরের কথা সামান্যতম পার্থক্য লক্ষ্য করতো না। এ কারণে তাঁর উপরে মানুষ অত্যন্ত ভরসা করতো, এজন্য তারা তাঁকে শুধু মোহাম্মাদ নয়, বরং 'মোহাম্মদ আমীন' বলে ডাকতো, অন্য দিকে সেই সমাজের এই অবস্থা ছিল।

এভাবে একজন নবীর জীবন-পদ্ধতি যা তিনি আল্লাহর পক্ষ থেকে নিয়ে আসা হুকুম-আহকাম দ্বারা সুসজ্জিত করেছেন ধীরে ধীরে মক্কার অজ্ঞ কুরাইশদের সমাজের মেজাজকে মসৃণ করে তোলেন। প্রথমে তিনি তাদের মনকে মসৃণ করেছেন যাতে তারা ভালো, সৎ ও কল্যাণকর কাজকে বুঝতে পারে, জুলুম ও অত্যাচার, অনাচার, উৎপীড়ন ও নিপীড়নকে বুঝতে পারে, শোষণকে বুঝতে পারে।

সরকারের পথ মানুষের জীবনযাত্রার পথ নয়, কারণ সেই জীবনধারা নশ্বর। ক্বোরআনে পৃথিবীতে বসবাসকারী প্রাণী, মানুষের অনেক গুণাবলী তুলে ধরা হয়েছে। এই প্রাণীর কাজ হলো যে, সে পরীক্ষার মধ্য দিয়ে যাবে এবং মৃত্যুর পর যখন সে তার অস্থায়ী জীবন অতিক্রম করে তার অনন্ত জীবনে আসবে, তখন সে একটি জান্নাত পাবে যেখানে তার জন্য স্থানে স্থানে নদী ও ঝর্ণা প্রবাহিত হবে, সূরা রহমানে যার বিবরণ দেওয়া হয়েছে। ক্বোরআনে সর্বজ্ঞ আল্লাহ অনেক জায়গায় জাহান্নামের কথা উল্লেখ করে বলেছেন যে, সবাইকে তাঁর দিকে ফিরে যেতে হবে।

এভাবে যখন তাদের মেজাজ মসৃণ হলো তখন তিনি (সঃ) নবুয়্যতের ঘোষণা দিলেন। আর এই ঘোষণা দেওয়ার পূর্বে তিনি (সঃ) আল্লাহর নিকট দোয়া প্রার্থনা করলেন: ...وَاجعَل لِي مِن لَدُنکَ سُلطاناً نَصِيراً. প্রার্থনা করেছিলেন ...আমাকে একজন সমব্যথী সাহায্যকারী দান করো। তাঁর উত্তরাধিকারী হযরত আলী (আঃ) তখন নয় বছর বয়সী ছিলেন। একজন ব্যক্তিও উঠে দাঁড়িয়ে বলল না যে, আমি তোমাকে সাহায্য করবো। অথচ রসূলুল্লাহ (সঃ) ঘোষণা করছিলেন যে, আজকে যে আমাকে সাহায্য করবে সে হবে আমার খলিফা, আমার ওয়াসী।

ক্বোরআনের একটি আয়াতের আলোকে এই শব্দটি দেখুন: ما محمد الا رسول মোহাম্মাদ একজন রসূল ছাড়া আর কিছুই নন। তাহলে বোঝা গেলো তিনি ঘুমন্ত অবস্থায় রসূল, জাগ্রত অবস্থায় রসূল, এবাদতের অবস্থায় একজন রসূল, মানুষের সাথে মেলা-মেশার অবস্থায় রসূল, কথা-বার্তায় রসূল, নির্দেশনা ও হুকুম আহকাম দেওয়ার অবস্থায় এক কথায় তাঁর মৃত্যুর পূর্ব পর্যন্ত তিনি জীবনের একটি মুহূর্তের জন্য রসূল হওয়ার অবস্থার বাইরে নন। সুতরাং তিনি তাঁর জীবনে যা কিছু বলবেন তা একজন রসূল হিসাবে বলবেন। আর ক্বোরআন বলছে তিনি (রসূল) নিজ ইচ্ছায় কিছু বলেন না, যা কিছু বলেন তা ওহী ব্যতীত নয়। তাহলে তিনি যদি বলেন যে আমার এই মিশনে (দ্বীন প্রচারে) আমাকে সাহায্য করবে সে আমার খলীফা ও ওয়াসী হবে, তার মানে এ কথা তাঁর কথা নয়, বরং তা ওহী বা আল্লাহর কথা।

মক্কাতে এতদিন দুর্বল শ্রেণীর মানুষের উপরে জুলুম হচ্ছিল, কিন্তু আমীন ও সাদিক্ব মোহাম্মাদের উপরে হচ্ছিল না। কিন্তু তৌহীদের বার্তা দেওয়ার সাথে সাথে সেই আমীন ও সাদিক্ব এবং তাঁর সঙ্গী-সাথীদের উপরেও এবার অকথ্য অত্যাচার শুরু হয়ে যায়। আর সে অত্যাচার এতো চরম পর্যায় পৌঁছে যায় যে, তাঁর এই জীবন শৈলী তাদের গলার কাঁটা হয়ে দাঁড়ায় এবং তাঁকে মক্কা ত্যাগ করে মদীনাতে হিজরত করতে হয়। যখন মদীনায় এই জীবনধারার উত্থান ঘটে, তখন অন্ততঃ সাত বছর অবধি জ্ঞানী ও লেখকেরা তাঁর থেকে সম্পর্ক ছিন্ন করে দূরে সরে ছিল, যারা আল্লাহর রসূলকে ধ্বংস করার চেষ্টা করছিল, যাতে তাঁর রেসালতের মিশন শেষ হয়ে যায়। কিন্তু সাত বছর পর যখন মক্কা বিজয় হল, তখন সেই লোকেরা মদীনা থেকে মক্কায় গিয়ে বিভেদ সৃষ্টি করতো, ঝড় তুলতো, তারা ছিল নাজরানের খ্রিস্টান ও ইহুদী। এই লোকদের বিদ্রোহ

ও যুদ্ধের ষড়যন্ত্র সেখান থেকে আল্লাহর রসূল (সঃ) এই বলে বন্ধ করে দিয়েছিলেন যে, যে ব্যক্তি আবু সুফিয়ানের ঘরে গিয়ে আশ্রয় নেবে সে নিরাপদ। এভাবে বদর, উহুদ ও খন্দকের সময়ে যে যুদ্ধ সংঘটিত হয়েছিল, তার দরজা বন্ধ করে দেওয়া হয়েছিল, কিন্তু সেখান থেকে যারা আসতে শুরু করেছিল, তাদের মনোভাব পরিবর্তন হয়েছিল কিনা তা নিয়ে এখন প্রশ্ন থেকে যায়।

নবীর বংশধারার সাথে এই শত্রুতা কেন? এই শত্রুতা পুরানো শত্রুতা চলে আসছিল। অবশেষে এমনটা ঘটল যে, হুজুররা আবু হুরায়রা ও তার কিছু ধী শক্তি সম্পন্ন মানুষকে কব্জা করলেন। যেমন বুখারী নিজেই বলেছেন আমার মেমোরীতে দুই লাখ হাদীস রয়েছে, যার মধ্য থেকে আমার এই পরিমাণ হাদীস নির্ভেজাল মনে হয়েছে। অর্থাৎ হাদীসগুলোকে স্তূপিকৃত করে রেখেছিল। আর ঠিক যেমন খোদার রসূল (সঃ) বলেছিলেন যে, আমাদের উপরে যে মুসীবত ও কষ্ট আরোপিত করা হয়েছে তা কোনো নবী-রসূলের প্রতি করা হয়নি, তা বাস্তব রূপ ধারণ করেছিল। সময় বলে দিচ্ছিল যে, ধীরে ধীরে মুনাফিকদের অতি সূক্ষ্ম ষড়যন্ত্র এমন শক্তি লাভ করতে শুরু করে যে, যে ঘটনাগুলো ইসলামের ভিত্তি মজবুত করে এবং নবীর জীবনধারাকে সামনে নিয়ে আসছিল, সেগুলোকে আড়ালে রাখার চেষ্টা করা হচ্ছিল।

আমরা অনেক বই পড়েছি কিন্তু মুবাহেলাকে যেভাবে উল্লেখ করা হয়েছে তার বিশ্লেষণাত্মক দিকটি লেখকেরা কেন মিস করেছেন জানি না!!! তাহলে কি অনুভূতি লোপ পেয়েছিল? না, এমনটা নয়। আব্বাসীয় শাসনামলে, আব্বাসী শাসক একবার সমস্ত বড়ো লেখক, সমস্ত মহান ব্যক্তিদের, জমিদারদের এবং গণ্যমান্য ব্যক্তিদেরকে ডাকে এবং ইমাম জাফর সাদিক্ব (আঃ)-কে সেখানে ডেকে তাঁর সামনে তাদের পুরষ্কার দিয়ে সম্মানিত করে, তাদের এক পাশে মামুন ও এক পাশে মামুনের ভাই মোহাম্মাদ আমীন বসে ছিল। তাদেরকে অনেক অর্থ ও উপঢৌকন দেয়। অথচ সেখানে রসূলের সন্তান ইমাম জাফর সাদিক্ব (আঃ)কে তাদের তুলনায় কিছুই দেয় না, শুধু লোকেদের মুখ বন্ধ করার জন্য তাঁকে না দেওয়ার মতো কিছু দেয়। মামুন যখন বলল: পিতা মহোদয়! আপনি এই নগণ্য পুরস্কার দিয়ে জাফর সাদিক্ব (আঃ)-কে অপমান করলেন, আপনি প্রত্যেককে প্রচুর পরিমাণে দিয়েছেন এবং ইমাম জাফর সাদিক (আঃ)-কে অতি অল্প দিয়েছেন। হারূন রশীদ বলল: বৎস! তুমি রাজনীতি বোঝার চেষ্টা করো, আসলে আমরা যে শাসন ক্ষমতা কব্জা করে আছি তা তাদের, আমরা তাদের বেশি দিলে তারা শক্তিশালী হয়ে যাবে।

এই ঘটনাটি পড়লে ধারণা করা যায় যে, সমাজ কীভাবে চলছিল যেখানে মিথ্যা পূর্ণ শক্তিতে প্রবল হয়ে উঠছিল এবং সেখানে এমন কিছু মানুষের চরিত্র ছিল যারা রসূল (সঃ) তাঁর পবিত্র বংশধরের বিরোধিতায় প্রস্তুত ছিল। এই জীবন-পদ্ধতিকে বাঁচানোর জন্য আল্লাহর রসূল (সঃ) হযরত আলী (আঃ)-কে অসিয়ত করেছিলেন যে, আলী! যখন পৃথিবীর সব মানুষ দুনিয়া অভিমুখে ছুটে চলবে তখন তুমি দ্বীনকে রক্ষা করবে। আলী (আঃ) তাঁর দায়িত্ব পূরণ করেছিলেন। আর এমনভাবে দায়িত্ব পূরণ করলেন যে, যখন আলী (আঃ)-এর ঘর পুড়িয়ে দেওয়া হচ্ছিল, যখন আলী (আঃ)-এর গলায় রশি বেঁধে টেনে নিয়ে যাওয়া হচ্ছিল, তখন তাঁর স্ত্রী ফাতেমা যাহরা (আঃ) বলছিলেন: ওহে আবুল হাসান! আপনি কেন চুপ করে আছেন? আপনার উপর এই নৃশংসতা চলছে আর আপনি আপনার আওয়াজ তুলছেন না? তখন তিনি একটাই উত্তর দিলেন: ওহে আমার সহধর্মিণী! আমার কর্তব্য এবং আমার পথ, আমার জীবন পদ্ধতি সেটিই যা আল্লাহর রসূল (সঃ) আমার উপরে অর্পিত করেছেন, তা ভিন্ন নয়। কারণ তিনি বলেছিলেন: হে আলী, তুমি আমার দ্বীনকে রক্ষা করো। তাই আমি যদি এ সময় তরবারি তুলে নিই তাহলে লোকে বলবে আলী তরবারি তুলেছিলেন রাজত্ব করার জন্য, ক্ষমতা দখল করার জন্য, খেলাফত অর্জন করার জন্য।

এই পরম্পরা বাগে ফেদাক দখল করার পর সরকার গঠনের চিত্র হয়ে ওঠে। বড় বড় সেনাবাহিনী গঠিত হয় এবং যুদ্ধ শুরু হয়। ঘর-বাড়ি

পুড়িয়ে দেওয়া হয়, হযরত মহসিন (আঃ) এবং হযরত ফাতেমা যাহরা (সঃ) শহীদ হন, কিন্তু আলী (আঃ) ধৈর্য্যশীলতার পরিচয় দেন এবং নীরব থাকেন। তিনি সমস্ত ঝামেলা ও মুসীবত নিজের উপর নিয়েছিলেন। কিন্তু তাঁর উপরে আক্রমণ না হওয়া পর্যন্ত যুদ্ধের ক্ষেত্রে সেনাবাহিনী গঠন করেন নি।

এদিকে আবু সুফিয়ান ও মুহাদ্দেসীন এবং ক্রয়কৃত বর্ণনাকারীরা নিজেদের কাজ হাসিল করতে থাকে। এমনকি একটা সময় এমন আসলো যে, মোয়াবিয়া ইবনে আবু সুফিয়ানের মতো মানুষ আমীরুল মোমেনীন হয়ে গেলো!!! আলী (আঃ)-এর উপর সিফ্ফীনে যুদ্ধ চাপিয়ে দেওয়া হলো। এই যুদ্ধে হযরত আম্মার ইবনে ইয়াসিরের শাহাদত হলো, যাঁর সম্পর্কে আল্লাহর রসূল (সঃ) বলেছিলেন: আম্মারকে একটি বিদ্রোহী দল হত্যা করবে। মোয়াবিয়াকে যখন জানানো হয় যে, আম্মার আমাদের দ্বারা হত্যা হয়েছে, তাহলে আমরা বিদ্রোহী গোষ্ঠী হয়ে গেলাম। তখন মোয়াবিয়া বলে: না, এর দায়িত্ব আমাদের উপরে নয়, আলীর উপরে, কারণ আলী আম্মারকে নিয়ে এসেছে।

পাঠকবর্গ! আপনারা ভেবে দেখেছেন? কীভাবে মানুষের মন-মস্তিষ্ক ঘুরিয়ে দেওয়ার চেষ্টা হচ্ছিল? যে মক্কায় রসূলুল্লাহ (সঃ) মানুষের মন-মস্তিষ্ককে ও কর্কশ মেজাজকে মসৃণ করেছিলেন, সেই মক্কাতেই এই ধরণের ষড়যন্ত্রের সূত্র এদের হাত ধরে ধীরে ধীরে উত্থিত হচ্ছিল। আর এক সময় তা পূর্ণ শক্তি নিয়ে মোয়াবিয়ার ষড়যন্ত্রের পুরো লাভায় পরিনত হয়। মোয়াবিয়া যখন পরকালীন পরিণতি ভোগ করার জন্য দুনিয়া ত্যাগ করলো তখন সেই মোনাফেক্বীর লাভা জোয়ালামুখীর রূপ ধারণ করে বিষ্ফোরিত হয় এবং আগ্নেয়গিরিতে পরিণত হয়।

আর এখন মোনাফেক্বী নয় বরং এজীদ পূর্ণ কুফুরীর ও দম্ভের সাথে ঘোষণা দেয় যে, না কোন ওহী এসেছিল আর না কোন রসূল এসেছিল। অর্থাৎ মন-মস্তিষ্কে সিলমোহর লাগিয়ে দিয়েছিল। এটা অন্য কথা যে, ইমাম হোসায়েন (আঃ) আরবের অত্যাচারী, অনাচারী ও শাসকদের পদ লেহনকারী এবং নির্যাতিতদের রক্ত পান কারীদের প্রজ্জ্বলিত আগুন নেভানোর জন্য নিজ ছয় মাসের দুগ্ধপায়ী শিশুকে ক্বুরবানী দিয়ে দিয়েছেন, সেই ছোট্ট শিশুর সুমিষ্ট হাসিকে বিসর্জন দিয়েছেন।

সারমর্ম হলো অবস্থা ও সকল পরিবর্তিত পরিস্থিতির কারণে জীবন ধারায় বড় ধরণের পরিবর্তন লক্ষ্য করা যাচ্ছিল বিশেষ করে এজীদের আমলে। আর কারবালার সেই মহা বিয়োগান্তক ঘটনাটি ঘটেছিল, সেটা যদি আমরা জীবনধারা অধ্যয়ন করি, তাহলে রসূল (সঃ)-এর মহৎ জীবন এবং তাঁর পবিত্র বংশধরের জীবন ধারায় জীবনাদর্শের ব্যাখ্যা পাওয়া যায়। আর মন-মস্তিষ্কে আলোর জন্ম হয় যা পরকালের প্রতি আমাদের ভক্তির সমগ্র দৃশ্যকে সামনে নিয়ে আসে।

আর এখনও জুলুম অত্যাচারের যুগ চলছে, তবে মনে রাখতে হবে নবীপাকের শেষ প্রতিনিধির আবির্ভাবের সময় অতি সন্নিকটে। ইমাম হোসায়েন (আঃ)-এর রক্তের প্রতিশোধ গ্রহণকারী আমাদের যুগের কর্তা ও আমাদের মাওলা ও আক্বা শীঘ্রই আত্মপ্রকাশ করবেন। প্রত্যেক আজাদার, প্রত্যেক অশ্রু বিসর্জন দাতা নামাজীর হাত উত্তোলিত রয়েছে তাঁর আবির্ভাবের জন্য দোয়া করার উদ্দেশ্যে। আমাদের আক্বা! আপনি আবির্ভাবে ত্বরান্বিত করুন। সবাই শোকে, অশ্রুসিক্ত, এবং প্রতিটি প্রার্থনায়, তারা আপনার আবির্ভাব ত্বরান্বিত হওয়ার জন্য প্রার্থনা করছে। আল-আজল আল-আজল ইয়া মাওলায়া ইয়া সাহিবাজ্জামান।

১২ নং পৃষ্ঠার পরবর্তী অংশ

কোরআন-হাদীস এবং রসূল (সঃ)-এর সুন্নাহ থেকেও শোকপালনের কথা জানা যায়। সব শেষে সেই কয়েকজন বুজুর্গের নাম উদ্ধৃত করছি যাঁদের জন্য নবী স্বয়ং কেঁদেছিলেন।

১- নিজ পুত্র ইব্রাহীম (আঃ)-এর মৃত্যুতে রসূলুল্লাহ (সঃ)-এর কান্না।

২- মায়ের কবরে গিয়ে নবীর কান্নাকাটি করা এবং অন্যদের কাঁদানো।

৩- তাঁর পরমা মমতাময়ী চাচী ফাতেমা বিনতে আসাদ (রাঃ)-এর মৃত্যু উপলক্ষে রসূল (সঃ)-এর কান্না।

৪- হযরত হামজার শাহাদাতে নবীর কান্না।

৫- হযরত জাফর ইবনে আবী তালিবের শাহাদাতে রসূলুল্লাহ (সঃ)-এর কান্না।

৬- হযরত যায়েদ বিন হারিসার শাহাদাতের মহানবী (সঃ)-এর কান্না।

৭- হযরত উসমান ইবনে মাযউনের মৃত্যুতে মহানবী (সঃ)-এর কান্না।

৮- হযরত সাদ ইবনে রাবয়ীর মৃত্যুতে রসূলুল্লাহ (সঃ)-এর কান্না।

৯- হযরত ইমাম হোসায়েন আলাইহিস সালামের শাহাদাতে রসূলুল্লাহ (সঃ)-এর কান্না। শাহাদাতের আগে এবং শাহাদাতের পরেও।

এই সমস্ত বিষয়ের বিস্তারিত জানার জন্য শুবহাতে আযাদারী গ্রন্থটির প্রথম খন্ডের ২৮৮ থেকে ৩০৭ পৃষ্ঠা অবধি অবশ্যই অধ্যয়ন করুন।

হে আবা আব্দিল্লাহ আপনার উপর শান্তি বর্ষিত হোক, আপনাকে ভালবাসি হে হোসায়েন (আঃ)।

১৬ নং পৃষ্ঠার পরবর্তী অংশ

তাহলে আল্লাহর রসূলের মাধ্যমে, আমার পিতা আলী ইবনে আবি তালিব (আঃ)-এর মাধ্যমে, আমার মাতা ফাতেমা যাহরা (সাঃ) এবং আমার ভাই হাসান মুজতাবা (আঃ)-এর মাধ্যমে তোমার কাছে প্রার্থনা করছি যে, তুমি আবার এই ঘোড়াগুলো জীবিত করে দাও। তখনও হযরতের দোয়া শেষও হয়নি যে, পাঁচটি ঘোড়াই প্রাণ ফিরে পেলো এবং এসব দেখে আমি যা বলেছিলাম তার জন্য আমি সত্যিই অনুতপ্ত হলাম এবং হযরতের ইমামতিতে আন্তরিকভাবে বিশ্বাস স্থাপন করলাম।[1]

পাঠকগণ! দেখলেন? এই ঘটনাগুলো সেই অগণিত ঘটনার মধ্য হতে কতিপয় ছিল যা আলিমগণ তাঁদের মূল্যবান গ্রন্থাদিতে বর্ণনা করে আমাদের কাছে পৌঁছে দিয়েছেন আজও ইমামগণের অনুরাগী ও তাঁদের যিয়ারতকারী নিকট থেকে অথবা দূর থেকে ইমাম হোসায়েন (আঃ)-এর সাথে সম্পর্ক স্থাপন করে যিয়ারতকারী নিজে বা অন্যের জন্য উত্তম কামনা-বাসনা অর্জন করেন। আমরা সকলে ইমাম হোসায়েন (আঃ)-এর ওসীলায় আল্লাহর কাছে দোয়ার জন্য হাত তুলছি যে, তিনি যেন ইমাম হোসায়েন (আঃ)-এর রক্তের প্রতিশোধ গ্রহণকারী আমাদের যুগের ইমাম হযরত মাহদী (আঃ)-এর আবির্ভাবকে ত্বরান্বিত করে দেন। আর আমাদের সকলকে তাঁর সঙ্গী হয়ে প্রথমে মদীনাতে রসূলের পরিবারের উপরে নৃশংসতার প্রতিশোধ নেওয়ার সুযোগ দেন, অতঃপর সকল নিরাপরাধ ইমামগণের (আঃ) উপর সংঘটিত নৃশংসতার প্রতিশোধ নেওয়ার তৌফীক্ব দেন। আর যতদিন তিনি আমাদেরকে জীবিত রাখেন, তিনি যেন মাসূম ইমামগণের যিয়ারতের সৌভাগ্য দান করেন এবং আখেরাতে তাঁদের সুপারিশ ও নৈকট্য মঞ্জুর করে নেন। আমীন ইয়া রব্বাল আলামীন

---

[1] *তোহফাতুল মাজালিস, পৃঃ ১৮৮।*

আযাদারী হলো সাহাবায়ে কেরামদের সীরাত

প্রিয় সম্মানীয় পাঠকবর্গ! আল-মুন্তাযারের বিশেষ মহর্রম সংখ্যায় শোক, কান্না, কাঁদানো এবং শোকানুষ্ঠানের বিভিন্ন আচার-অনুষ্ঠান নিয়ে প্রাণবন্ত বিতর্ক হতে থেকেছে এবং ইনশাআল্লাহ এ ধারাবাহিকতা ভবিষ্যতেও অব্যাহত থাকবে। এই প্রবন্ধে আমরা ইতিহাস ও হাদীসের কিতাবে উল্লেখিত বিষয়ের উপর সংক্ষেপে আলোকপাত করতে চাই। শিরোনামটি নিজেই বলে দেয় যে, মহানবী (সঃ)-এর সাহাবায়ে কেরামও আযাদারী, শোক, কান্না, কাঁদানোতে এবং শোক প্রকাশে অগ্রগামী ছিলেন।

বিগত সংখ্যাগুলোতে নবীপাক (সঃ) সম্পর্কে এবং তাঁর কান্নাকাটি ও অশ্রু ঝরানো সম্পর্কে যা কিছু বলা হয়েছে তা দ্বারা তো আযাদারী প্রমাণিত হয়েছেই। তা ছাড়াও নবীপাক (সঃ)-এর সাহাবায়ে কেরামের মধ্যেও মৃত ব্যক্তির জন্য কান্নাকাটি ও শোক প্রকাশের প্রচলন ছিল তা প্রমাণ হয়। ইতিহাস সাহাবাদের আযাদারী ও শোক প্রকাশের বিভিন্ন নিদর্শন সংরক্ষণ করেছে। উদাহরণ স্বরূপ কয়েকটি দৃষ্টান্ত তুলে ধরা হলো:

মহানবী (সঃ)-এর শাহাদাতে মক্কাবাসীর শোক

সাঈদ ইবনে মুসাইয়াব বর্ণনা করেন: যখন রসূলুল্লাহ (সঃ) ইহলোক ত্যাগ করে চলে গেলেন তখন মক্কা নগরী কান্নার আওয়াজে প্রকম্পিত হয়ে উঠল।[1]

তবে এই নিবন্ধটি লেখার জন্য, আমরা সৈয়দ মুজতবা উসাইরী সংকলিত শুবহাতে আযাদারী নামক গ্রন্থের প্রথম খন্ডের ৩০৯ পৃষ্ঠা হতে তথ্য সংগ্রহ করেছি।

নবীপাকের শোকে আয়েশা ও মদীনার নারীদের শোকপালন

আহলে সুন্নাহ গ্রন্থে মহানবী (সঃ) হতে আয়েশা (রাঃ) সম্পর্কে অনেক হাদীস উদ্ধৃত হয়েছে। যেমন তারীখে মদীনা ও দামেস্ক নামক গ্রন্থে ইবনে আসাকির বর্ণনা করেছেন যে, নবীপাক (সঃ) বলেছেন: আয়েশার কাছ থেকে তোমার দ্বীনের কিছু অংশ নিয়ে নাও।[2] অনুরূপ অন্য ইতিহাসবিদরা লিখেছেন: তোমাদের অর্ধেক দ্বীন হুমায়রা (মা আয়েশার একটি উপনাম)-এর কাছ থেকে নিয়ে নাও।[3] আরও বর্ণিত হয়েছে: তোমাদের দুই তৃতীয়াংশ দ্বীন আয়েশার কাছ থেকে নিয়ে নাও।[4]

দ্রষ্টব্য: এই হাদীসগুলো তাদের জন্য বর্ণনা করা হয়েছে যারা তাদের কথাকে নির্ভরযোগ্য বলে বিশ্বাস করে, অন্যথায় এই হাদীসগুলো হাদীসের মান অনুসারে বৈধ নয়। আর আহলে সুন্নতের দৃষ্টিতে আয়েশা হতে বর্ণিত প্রত্যেকটি হাদীস তাদের জন্য হুজ্জাত বা প্রমাণিত।

---

[1] মোহাম্মাদ ইবনে ইসহাক্ব ইবনে আব্বাস ফাকেহী প্রণীত এবং সন ১৪১৪ হিজরীতে দারু খিযর বাইরুত হতে মুদ্রিত 'আখবারু মক্কাতু ফী কাদীমিদ্দাহরি ওয়া হাদীসাহ্', খঃ ৩, পৃঃ ৮০, হাঃ ১৮৩২, তাঁর মৃত্যু সন ২৫৭ হিজরী; এই গ্রন্থের বিশ্লেষক হলেন আব্দুল্লাহ্ দাহায়েশ; অনুরূপ হেবাতুল্লাহ ইবনে হাসান ইবনে মন্সূর আবুল ক্বাসিম প্রণীত অন্য একটি গ্রন্থ 'এতেক্বাদু আহলুস সুন্নাহ্', খঃ ৭, পৃঃ ১২৯২, হাঃ ২৪৫১, এনার মৃত্যু সন ৪১৮ হিজরী, গ্রন্থটি মুদ্রিত দারু ত্বইয়েবাহ্, রিয়াদ, সৌদি আরব।

[2] ইবনে আসাকির দ্বারা প্রণীত ও ১৯৯৫ খ্রীষ্টাব্দে দারুল ফিকর বাইরুত হতে মুদ্রিত তারীখে মদীনা ওয়া দামিশক্ব, খঃ ৩০, পৃঃ ৪৫৯,

[3] ইবনে কাছীর দ্বারা প্রণীত ও দারুন নাশর হতে মুদ্রিত সীরাতুন্নাবাবিয়া, খঃ ২, পৃঃ ১৩৭; আবুল ফিদা ইসমাঈল ইবনে উমর দ্বারা প্রণীত ও মাক্তাবাতুল মায়ারিফ, বাইরুত হতে মুদ্রিত আল-বেদায়া ওয়ান্নেহায়াহ্, খঃ ৩, পৃঃ ১২৯।

[4] আব্দুল হাই ইবনে আহমাদ আল-হাম্বালী প্রণীত: 'শুযরাতুয যাহাব ফী আখবারু মিন যাহাব', খঃ ১, পৃঃ ৬২; শাহাবুদ্দীন সৈয়েদ মাহমূদ আলূসী বাগদাদী প্রণীত: 'রূহুল মায়ানী ফী তাফসীরিল ক্বুরআনিল আযীমুস সাবয়া মাছানী', খঃ ৩, পৃঃ ১৫৫।

এবার দেখো আয়েশা (রাঃ) কান্নার বিষয়ে কী বলছেন? তিনি বলছেন: নবীজির ইন্তেকালের পর, তাঁর শোকে, আমি অন্যান্য মহিলাদের (নবীর অন্যান্য স্ত্রী এবং মদীনার মহিলারা ছাড়া) সাথে দাঁড়িয়ে আমার মুখ ও বুকে প্রহার করছিলাম।[1]

এই হাদীস সম্পর্কে সালেহী শামী লিখেছেন: এই হাদীসটি শুধুমাত্র ইবনে ইসহাক বর্ণনা করেছেন। আর যেহেতু ইবনে ইসহাক হাদীস শ্রবণ করার বিষয়টি স্পষ্ট করেছেন তাই তাঁর হাদীসটি হাসান ও নির্ভরযোগ্য।

ইয়াহইয়া ইবনে ইবাদ বলেন আমি আব্দুল্লাহ ইবনে যুবায়ের হতে শুনেছি, তিনি তাঁর পিতা থেকে বর্ণনা করেছেন, তিনি আয়েশা (রাঃ) থেকে শুনেছেন, তিনি বলতেন যে, যখন রসূলুল্লাহ (সঃ)-এর রূহ কব্জ করা হলো, তখন তিনি আমার হুজরাতে ছিলেন। আমি একটি বালিশে তাঁর মাথা রেখে দিলাম এবং অন্যান্য মহিলাদের সাথে দাঁড়িয়ে মুখ বুক চাপড়াচ্ছিলাম।

দ্রষ্টব্য: সত্য কথা হলো ওয়াহাবী মতাদর্শের প্রতিষ্ঠাতা ইবনে তাইমিয়া হার্রানীও ইবনে ইসহাকের হাদীসের উপর নির্ভর করেছেন এবং লিখেছেন: ইবনে ইসহাক যখন বলবেন যে, আমার থেকে একটি হাদীস বর্ণিত হয়েছে, তখন হাদীস বিশারদগণের মতে তার হাদীসটি সহীহ ও নির্ভরযোগ্য বলে বিবেচিত হয়।[2]

একটা আপত্তি

কথিত আছে যে, যখন শিয়ারা শোকে আয়েশা (রাঃ)-এর বুকে ও মুখে থাপ্পড় মারার কাজটিকে নিজেদের আযাদারীর প্রমাণ হিসেবে তুলে ধরে তখন ওয়াহাবীরা বলে যে, আয়েশা নিজেই এই কাজটিকে ভুল বলে ঘোষণা করেছেন এবং স্বীকার করেছেন যে, আমি এই কাজটি করেছি মূর্খতা, অজ্ঞতা ও অল্প বয়সের কারণে।

শিয়াদের উত্তর

১- আয়েশা (রাঃ)-এর কর্মের ক্ষেত্রে যদি ওয়াহাবী মতবাদের এই অভিমতটি গ্রহণ করা হয়, তবে তাঁর সমস্ত কর্মের ক্ষেত্রে একই সম্ভাবনা গ্রহণ করা উচিত এবং তারপর যেখানে আয়েশার কাছ থেকে দ্বীনের দুই-তৃতীয়াংশ গ্রহণ করতে বলা হয়েছে তার কী হবে? অথবা, আগের লাইনগুলোতে নবীপাক (সঃ) হতে বর্ণিত অর্ধেক ঈমান বা দুই-তৃতীয়াংশ দ্বীন আয়েশা হতে নিয়ে নাও সেগুলোর কী হবে?

২- ধরে নেওয়া যাক যে, আয়েশা তাঁর শোক প্রকাশ করা, বুক চাপড়ানো এবং মুখে চড় মারা ইত্যাদির জন্য অনুশোচনা প্রকাশ করেছেন এবং বলেছেন যে, এগুলো তিনি অল্প বয়স্ক হওয়ার কারণে করেছেন। ঠিক আছে তাই মেনে নেওয়া হলো, তবে সাহাবায়ে কেরামের মহিলারা যাঁরা তাঁর চেয়ে বয়সে বড় এবং বুদ্ধিমতী ছিলেন এবং তাঁর সাথে বুক চাপড়াচ্ছিলেন, কই তাঁরা তো অনুশোচনা করেন নি?

(৩) হযরত আয়েশার দাবী যে মৃত্যুকালীন সময়ে মহানবী (সঃ)-এর মস্তক তাঁর বুকে ছিল তা গ্রহণযোগ্য নয়, কারণ আমীরুল মো'মেনীন হযরত আলী (আঃ)-এর বক্তব্য সম্পূর্ণরূপে এই দাবির পরিপন্থী। আমীরুল মো'মেনীন (আঃ) বলেন: মহানবী (সঃ) যখন দুনিয়া থেকে বিদায় নেন, তখন তাঁর বরকতময় মস্তক আমার বুকে ছিল।[3]

উল্লেখ্য: অনেক হাদীসে হযরত হামজা (আঃ)-এর শাহাদাতের ঘটনা বর্ণিত হয়েছে যে, রসূলুল্লাহ (সঃ) স্বয়ং কেঁদেছেন, শোক প্রকাশ করেছেন এবং সাহাবায়ে কেরামকে তাঁর জন্য কাঁদার ও মাতম

---

[1] *আবু মোহাম্মাদ আব্দুল মালিক ইবনে হিশাম ইবনে আইয়ুব আল-হুমায়রী আল-মোয়াফিরী প্রণীত: আস সীরাতুন নাবাবিয়াহ্, খঃ ৬, পৃঃ ৭৩, তাঁর মৃত্যু: ২১৩ হিজরী; মুসনাদে আহমদ ইবনে হাম্বল, খঃ ২, পৃঃ ২৭৪, হাঃ ২৬৩৯১ আল-কামিল ফিত্তারীখ, খঃ ২, পৃঃ ১৮৬।*

[2] *মজমুয়াতুল ফাতাওয়া, খঃ ৩৩, পৃঃ ৮৬।*

[3] *নাহজু -বালাগা খুতবা নং ১৭২।*

করার নির্দেশ দিয়েছেন। এটা স্বয়ং নবী করীম (সঃ)-এর জীবনের একটি দৃষ্টান্ত যে, তিনি কাঁদতে নিষেধ করেন নি, বরং কান্নার নির্দেশ দিয়েছেন, অনুরূপ আহলেবায়েত (আঃ) ও কাউকে বাধা দেননি এবং নিষেধও করেন নি।

হিজরী সপ্তম শতাব্দীর একজন বিখ্যাত সুন্নী পন্ডিত ইবনে আছীর জাযারী যিনি সুন্নীদের অন্য একজন বিখ্যাত আলিম বরং ওয়াহাবীদের একজন জনপ্রিয় পন্ডিত ওয়াক্কেদী হতে বর্ণনা করেছেন যে, সেই দিন (অর্থাৎ হযরত হামযার শাহাদাত দিবস) থেকে আজ পর্যন্ত মহিলারা প্রথমে হযরত হামযার জন্য এবং পরে তাদের শহীদদের জন্য কাঁদে।[1]

এটা এজন্য ঘটেছিল যে, যখন নবী (সঃ) শুনলেন যে, আমার চাচা হামযার জন্য কাঁদার মতো কেউ নেই, তখন সাহাবায়ে কেরাম তাঁদের মহিলাদেরকে হযরত হামযার জন্য কাঁদতে বললেন। যখন এই নারীদের কান্নার আওয়াজ আল্লাহর রসূল (সঃ)-এর কানে পৌঁছল, তখন তিনি এই মহিলাদের জন্য দোয়া করলেন।[2]

দ্রষ্টব্য: আযাদারীর জন্য স্বয়ং এটি একটি স্বাভাবিক আদেশ।

হযরত উসমানের কামিজ নিয়ে এক বছর যাবৎ শোক ব্যক্ত

শোক ব্যক্ত করা একটি সহজাত ও স্বাভাবিক কাজ, দেখা যায় যে, প্রতিটি ধর্মেই প্রিয়জনের মৃত্যুতে কান্নাকাটি করাকে সম্মানের দৃষ্টিতে দেখা হয়। অর্থাৎ এই স্ববাভসিদ্ধ কাজটি সর্বত্র চলতে থাকে। ক্বুরআন, হাদীস ও রসূলের সুন্নাহ এর সাক্ষী, আর সাহাবায়ে কেরাম ও অন্যান্য মুসলমানও তা অনুসরণ করে।

কিন্তু যে বিষয়টি মনোযোগ ও বিবেচনার যোগ্য তা হলো, ইবনে তাইমিয়া হার্রানী ও তার অনুসারীরা শিয়াদের আযাদারীর সমালোচনা করে এবং শোক পালন করাকে মূর্খতা বলে মনে করে। অথচ সুন্নীরা যখন তাদের বুযুর্গ ও আলেমদের জন্য শোক প্রকাশ করে তখন তারা চোখ বন্ধ করে নেয় এবং নিজেদের ঠোঁট যেন সেলাই করে নেয়, তখন তাদের আপত্তিমূলক কথা আর শোনা যায় না। উদাহরণ স্বরূপ, তাদের তৃতীয় খলিফার হত্যার জন্য তাঁর কামিজ নিয়ে এক বছরের শোকপালন দেখুন:

মোয়াবিয়া উসমানের জামা ও আংটি মিম্বরে ঝুলিয়ে তার চারপাশে লোকদের জড়ো করে এবং এক বছর ধরে কাঁদতে থাকে এবং শোকপালন করতে থাকে। সিরিয়ার এক গোষ্ঠী এই শপথ করে যে, তারা বিছানায় শান্তিতে ঘুমাবে না এবং উসমানের হত্যাকারীদের হত্যা না করা পর্যন্ত বা নিজেরা নিহত না হওয়া পর্যন্ত তারা স্ত্রী-সহবাস করবে না। তারা এই অবস্থার মধ্যে জীবন যাপন করতে থাকে এবং প্রতিদিন তারা উসমানের জামাটি মিম্বরে নিয়ে যেতো এবং উসমানের জন্য এক বছর ধরে কাঁদতে থাকে।[3] তাহলে এর পরিলক্ষ্যে জান্নাতের যুবদের সর্দারদের জন্য আযাদারী করা, শোক পালন করা, অশ্রু বিসর্জন দেওয়া উত্তম আমল নয়?

ওয়াহাবীদের নিকট একটি প্রশ্ন

ওয়াহাবিজম এই ধরনের দাবির প্রতি কীভাবে সাড়া দেয়, যা প্রায়শই তাদের নিজস্ব ইতিহাসের বইয়ে পাওয়া যায়? স্পষ্টতই, আহলে বাইত (আঃ) এবং তাঁদের প্রেমিকদের সাথে তাদের গোঁড়ামি ও শত্রুতা আরও বেড়ে যায়। এ ধরণের লোকেরাই তো হবে জাহান্নামের ইন্ধন।

উমর ইবনে আব্দুল আজীজের শোকে আসমান-জমীনের ক্রন্দন

এটাও খুব আশ্চর্যের বিষয় যে, শহীদগণের সর্দার হযরত ইমাম হোসায়েন (আঃ)-এর শাহাদাতে শোকপালন করা নিয়ে অনেক বেশি

---

[1] ইবনে আছীর জাযারী প্রণীত উসুদুল গাবাহ্ ফী মারিফাতি সাহাবাহ খঃ ২, পৃঃ ৬৮।

[2] ইউসুফ ইবনে আব্দুল্লাহ ইবনে মোহাম্মাদ ইবনে আব্দুল বার্র প্রণীত আল ইস্তিয়াব, খঃ ১, পৃঃ ৩৭৪।

[3] আবু জাফর মোহাম্মাদ ইবনে জোরায়ের তাবারী প্রণীত তারীখে তাবারী, খঃ ৩, পৃঃ ৭০; শায়বানী প্রণীত আল-কামিল ফিত্তারীখ, খঃ ৩, পৃঃ ১৬১; শুবহাতে আযাদারী, খঃ ১, পৃঃ ৩১৫।

আপত্তি ও কু-মন্তব্য করা হয়। কিন্তু যদি তা তাদের প্রিয়জনদের বিষয় হয় তবে তাদের জন্য কান্না এবং মাতম করা জায়েয হয়ে যায়। কথিত আছে যে, উমর ইবনে আব্দুল আযীয, যিনি বনী উমাইয়াদের একজন খলিফা ছিলেন, তাঁর মৃত্যুতে জমিন ও আসমান কেঁদেছিল।

দেখুন: খালিদ রাবয়ী বলেন: তৌরাতে লেখা আছে যে, উমর বিন আব্দুল আযীযের মৃত্যুতে পৃথিবী ও আকাশ চল্লিশ দিন-রাত কাঁদবে।[1]

দৃষ্টি আকর্ষণ: আমরা তৌরাতে এমন কোনো লেখা দেখিনি; যাঁরা এই সব লিখেছেন তাঁরা যদি রেফারেন্স লিখে দেওয়ার কষ্ট করতেন তাহলে আমারও তৌরাতে সেই লেখাটি দেখে নিতে পারতাম। বলা যায় না যে, এই ভদ্রলোকেরা হয়তো বলবেন যে, এটি তৌরাত বিকৃত হওয়ার আগে লেখা ছিল। অবশ্য, তাঁদের জিজ্ঞাসা করা যেতে পারে যে, আপনারা এতো সব কোথা থেকে জানলেন?!

মিথ্যুকদের প্রতি আল্লাহর লানত (অভিশাপ) বর্ষিত হোক।

সুন্নী আলিমদের বিষয়ে কয়েকটি দৃষ্টান্ত

নিবন্ধের শেষে, কয়েকজন প্রবীণ সুন্নী আলিমদের মৃত্যুতে শোক পালনের উদাহরণ দেখুন।

১- আবু ইয়োলা (৩৪৬ হিজরী) আব্দুল মোমিন ইবনে খালফ, জাহেরিয়া মাযহাবের ফেক্কাহ শাস্ত্রবিদদের অন্যতম আর মোহাম্মাদ ইবনে দাউদের অনুসারী। যাহাবী তাঁকে হাদীস ও রেওয়ায়েতের জ্ঞানে আহলে সুন্নাহদের মধ্যে "ইমাম"-এর মর্যাদা দিয়েছেন এবং তার দাফন সম্পর্কে বলেছেন: আমি যখন আব্দুল মোমিনের জানাযায় অংশ নিয়েছিলাম তখন ঢাক-ঢোলের এমন আওয়াজ আমার কানে পৌঁছেছিল যেন কোনো সেনাবাহিনী বাগদাদ শহরে আক্রমণ করছে। জানাজার নামাজের সময় না হওয়া পর্যন্ত এই অনুষ্ঠান চলতে থাকে।[2]

উপরে উল্লিখিত কথাটি তাদের প্রত্যাখ্যানের জন্য যারা মনে করেন যে সাফাভিদের আমলে শিয়াদের শোক মিছিলে ঢোল, তাশা এবং অন্যান্য কিছু বাদ্যযন্ত্র ব্যবহারের প্রচলন শুরু হয়েছে। যদিও এই ঘটনাটি হিজরী তৃতীয় ও চতুর্থ শতাব্দীর।

২- জুওয়াইনী (৪৭৮ হিঃ) যাহাবী জুওয়াইনীর শোক অনুষ্ঠান সম্পর্কে নিজেই লিখেছেন:

প্রথমে তাঁকে তাঁর বাড়িতে দাফন করা হয়, তারপর তাঁর লাশ মাক্কবারাতুল হোসায়েন কবরস্তানে স্থানান্তরিত করা হয়। তাঁর শোকে ও দুঃখ বেদনায় তাঁর মিম্বর ভেঙ্গে ফেলা হয়, বাজার ও দোকান-পাট বন্ধ করে দেওয়া হয় এবং অনেক বেশি মার্সিয়া পাঠ করা হয়। তাঁর চারশত শিষ্য ছিলেন যাঁরা তাঁর কাছে থেকে জ্ঞান অর্জন করতেন। তাঁরা তাঁদের শিক্ষকের শোকে তাঁদের কলম ও কলমদানী ভেঙে ফেলে এবং এক বছরের জন্য শোকের চিহ্ন হিসাবে তাদের মাথা থেকে তাদের পাগড়ি খুলে ফেলে এবং তারা পুরো শহরে শোকগাথা ও মার্সিয়া পাঠ করতে থাকে। আর এই দীর্ঘ সময় কারোর হিম্মত হয়নি যে, তাঁদের মাথায় কেউ আমামা বা পাগড়ি রেখে দেবে। শিক্ষার্থীরা শহরের অলি-গলিতে শোকগাথা ও মার্সিয়া খানি সহকারে ঘুরতে থাকে।[3]

এগুলি ছাড়াও ৫৭১ হিজরীতে মৃত্যুবরণকারী ইবনে আসাকির এবং ৫৯৭ হিজরীতে মৃত্যুবরণকারী ইবনে জওযীর মৃত্যুতে শোক পালনের কথা বর্ণনা করা হয়েছে।

নিজের কেউ মারা গেলে কাঁদে বিচলিত হয়ে...। ইসলামী বিশ্বে এসব ঐতিহাসিক প্রমাণ থেকে জানা যায় যে, শোকপালন স্বাভাবিক নিয়মে চলে আসছে।

পরবর্তী অংশ ৮ নং পৃষ্ঠায় দেখুন

---

[1] *মুহাম্মাদ ইবনে আহমাদ লাযহাবী প্রণীত সিয়ারু এলামুন্নাবলা, খঃ ২, পৃঃ ৫১৪; জালালুদ্দীন সুয়ুতী প্রণীত তরীখুল খোলাফা, খঃ ১, পৃঃ২৪৫।*

[2] *সিয়ারু এলামুন্নাবলা, খঃ ১৫, পৃঃ ৮১।*

[3] *ঐ, খঃ ১৮, পৃঃ ৪৭৬।*

ইমাম হোসায়েন (আঃ)-এর তাঁর যিয়ারতকারীদের উপরে বিশেষ অনুগ্রহ

মহান আল্লাহ রব্বুল আলামীন বিভিন্ন ঘটনাবলী বর্ণনা করার জন্য পবিত্র ক্বোরআনের একটি বড় অংশ নির্দিষ্ট করেছেন। জাতিসমূহের উল্লেখ, নবী-রসূলগণের উল্লেখ এবং প্রতিটি ঘটনা ও কাহিনীতে তিনি রেখেছেন বিশেষ শিক্ষা। সুতরাং বিভিন্ন ঘটনাবলী দ্বারা যে শিক্ষা অর্জন হয় তা দ্বারা মানুষ নিজেকে যাচাই করে নিতে পারে, আর দেখা যায় অধিকাংশ ক্ষেত্রে বিবেকবান তা দ্বারা হেদায়েত বা সঠিক পথও পেয়ে যায়। আর মহান রব্বুল আলামীন বিভিন্ন আয়াতে এই ধরণের ঘটনা বর্ণনা করার সুপারিশও করেছেন। তার মধ্যে একটি হলো পবিত্র সূরা আরাফের ১৭৬ নং আয়াত, যেখানে ঘটনা বর্ণনা করার জন্য স্পষ্টভাবে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। সর্বশক্তিমান আল্লাহ বলেন: হে রসূল! অতঃপর তুমি তাদের কাছে ঘটনাগুলো বর্ণনা করো, (এভাবে) হয়তো তারা ভাবতে শুরু করবে।

বোঝা গেলো যে, ঘটনাসমূহ উদ্ধৃত করা প্রকৃতই আল্লাহর আদেশ, আল্লাহর ও তাঁর রসূলের সুন্নাহ্ (কর্মপদ্ধতি) আর এর দ্বারা মৃত অন্তরকে পুনরুজ্জীবিত করা হয়। আর উর্বর ভূমি অর্থাৎ মানুষের আত্মাকে প্রাকৃতিক শক্তিতে বলবান করা হয়। তাই আমরা হযরত ইমাম জাফর সাদিক্ব (আঃ)-এর হাদীস শরীফ পাঠকদের খেদমতে পেশ করার সৌভাগ্য অর্জন করতে চাচ্ছি যার বর্ণনাকারী হলেন আব্দুল্লাহ ইবনে ত্বাহ্হান। তিনি (আঃ) বললেন: ক্বেয়ামতের দিন সবাই কামনা করবে যে, হায় আফসোস আমি যদি ইমাম হোসায়েন (আঃ)-এর যিয়ারতকারী হতাম কতই না ভালো হতো!!! কেননা সেদিন প্রত্যেকে আল্লাহর নিকট ইমাম হোসায়েন (আঃ)-এর যিয়ারতকারীর কি মর্যাদা ও সম্মান তা লক্ষ্য করবে। যাওয়ারে হোসায়েন (আঃ)-এর সম্মান ও মর্যাদা প্রত্যক্ষ করবে।[1]

প্রিয় পাঠকগণ! এটা সত্য যে, আমাদের সকল ইমামগণ তাঁদের প্রিয়জনদের এবং বিশেষ করে যিয়ারতকারীদের অপরিসীম ভালোবাসেন। নীচে আমাদের উক্ত ঘটনাবলী বর্ণনা করার উদ্দেশ্য ব্যক্ত করতে চাচ্ছি।

১- আশা করছি আমাদের এই কল্যাণকর কাজটি মানুষকে কর্মঠ করে তোলার কারণ হবে।

২- এর দ্বারা হয়তো পবিত্র ও নিষ্পাপ ইমামগণের যিয়ারতকারীদের প্রতি আমাদের শ্রদ্ধা-ভালোবাসা বৃদ্ধি পাবে এবং আমরা হয়তো কাউকে অবজ্ঞা না করে বরং একে অপরকে নিজেদের চেয়ে উত্তম মনে করতে আরম্ভ করবো।

৩- হয়তো আমরা সকলেই সর্বশক্তিমান আল্লাহর খেদমতে এই ইমামদের বিশ্বাসী হওয়ার জন্য আমাদের অন্তরের অন্তস্থল থেকে কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করার মানসিকতা পাবো, যাতে আমাদের এই মহব্বত ও বেলায়েত দিন-প্রতিদিন বৃদ্ধি পাবে। কারণ তিনি বলেছেন: যদি তোমরা কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করো, তবে আমি অবশ্যই আমার নেয়ামত তোমাদের জন্য বৃদ্ধি করে দেবো।[2]

প্রিয় পাঠকগণ! আমরা নিম্নলিখিত ঘটনাগুলি শুধুমাত্র নির্ভরযোগ্য বই থেকে তা উদ্ধৃত করবো না, বরং তা দ্বারা পাওয়া শিক্ষাতেও সুগভীর দৃষ্টিপাত করবো ইনশা আল্লাহ।

প্রথম ঘটনা

জনাব আব্দুর রসূল, শহীদ সম্রাট ইমাম হোসায়েন (আঃ)-এর রওযার খাদেম, জনাব আব্দুল হোসায়েনকে বর্ণনা করছেন যে, আমি এক রাতে এক আরববাসীকে দেখলাম, যার খালি পা রক্তাক্ত ও ক্ষত দিয়ে রক্ত ঝরছে সে ইমাম হোসায়েন (আঃ)-এর রওযা জড়িয়ে ধরে রয়েছে। আমি তার সাথে কথা বললাম এবং অবশেষে তাকে এই পবিত্র স্থান থেকে বের হয়ে যেতে বাধ্য করলাম এই ভয়ে যে, পাছে তার ক্ষত এবং রক্ত পবিত্র রওযাকে নোংরা ও অপবিত্র না করে তোলে। এই ব্যক্তি হেরেম শরীফকে সম্বোধন করে বলল: ইয়া হোসায়েন! আমি ভেবেছিলাম এটা তোমার বাড়ি, কিন্তু এখন দেখছি এটা অন্য কারোর বাড়ি। সেই

---

[1] *কামিলুয যিয়ারত, অধ্যায় ৫০, পৃঃ ৪৪১, হাঃ ১।*

[2] *সূরা: ইব্রাহীম, আঃ ৭।*

রাতে তিনি স্বপ্নে দেখলেন যে, ইমাম হোসায়েন (আঃ)-এর আঙিনায় একটি সবুজ মিম্বর রয়েছে এবং তাঁর শ্রোতাদের মধ্যে রয়েছে মোমিনদের রূহ্। হযরত ইমাম হোসায়েন (আঃ) তাঁর রওযার খাদিমদের কাছে অভিযোগ করছেন যে, মরহুম সৈয়্যেদ আব্দুল হোসায়েন (আঃ) উঠে দাঁড়িয়ে অনুশোচনা করতে করতে বড়ই বিনম্রতা ও লজ্জিতভরে ইমাম হোসায়েন (আঃ)-কে বললেন: মাওলা! আমাদের দ্বারা কী বেআদবী হয়েছে বলেন। তখন হযরত ইমাম হোসায়েন (আঃ) বললেন: আজ রাতে আমার সবচেয়ে প্রিয় অতিথিকে আমার পবিত্র স্থান থেকে বের করে দেওয়া হয়েছে। এ কাজে আমি তোমাদের প্রতি সন্তুষ্ট নই এবং সর্বশক্তিমান আল্লাহও তোমাদের প্রতি সন্তুষ্ট হবেন না যতক্ষণ না তোমরা সেই যায়েরকে খুশি করছো। খাদিমগণ বললেন: আমরা তো তাকে চিনি না, আর এখন সে কাথায় রয়েছে তাও কিছুই জানি না। হযরত ইমাম হোসায়েন (আঃ) বললেন: তিনি বর্তমানে হাসান পাশার ঘরের তাঁবুর কাছে বিশ্রাম নিচ্ছেন। আমার সাথে তার দরকার ছিল। আর তা হলো সে আমার কাছে তার পুত্রের সুস্থতা চেয়েছিল, আর আমি তাকে তা দিয়েছি। আগামী কাল সে তার গোষ্ঠীর লোকদের নিয়ে আসবে তাকে খুব ভালোভাবে স্বাগত জানিয়ো। মরহুম আব্দুল হোসায়েন ঘুম থেকে জেগে উঠলেন, কিছু খাদিমকে সাথে নিয়ে সেই স্থানে পৌঁছে গেলেন, সেই ব্যক্তির সাথে দেখা করলেন, তাঁর হাতে চুমু দিলেন, তাঁর কাছে ক্ষমা চাইলেন, তাঁকে বাড়িতে নিয়ে গেলেন এবং আতিথেয়তা করলেন। পরের দিন তিনি আরোগ্যপ্রাপ্ত শিশুকে (যে প্যারালাইসিসে আক্রান্ত হয়েছিল) ও অন্যান্য কাফেলাসহ পবিত্র হেরেম শরীফে আসেন এবং তাঁকে খুব ভালোভাবে স্বাগত জানানো হয়।[1]

সুপ্রিয় পাঠকগণ! দেখলেন তো আপনারা? ইমাম হোসায়েন (আঃ) প্রত্যেক যিয়ারতকারীর প্রতি বিশেষ নজর রাখেন। তাঁর বাসস্থান সম্পর্কেও তিনি অবগত। তাঁর সাথে ঘটে যাওয়া বিষয় সম্পর্কেও অবগত। কোনো যিয়ারতকারীর সামান্যতম মনঃকষ্ট না কেবল তাঁর অপছন্দ বরং তা ইমাম (আঃ)-এর এবং মহান রব্বুল আলামীনের অসন্তুষ্টির কারণও। সুতরাং আমাদের প্রত্যেকের এই চিন্তা করতে বাধ্য করে যে, আমরা না কেবল যিয়ারতকারীদের সম্মান করবো, বরং কোনোভাবেই কোনো যিয়ারতকারীকে অসম্মান করবো না। নিজেরা ভদ্রতার পরিচয় দিই এবং তাঁদের সম্মানহানী না করি।

দ্বিতীয় ঘটনা

মহান ও উচ্চ সম্মানীয় মর্যাদাবান ব্যক্তিত্ব আখুন্দ মোল্লা আলী মোহাম্মাদ ত্বালেক্বানী যিনি ইমাম হোসায়েন (আঃ)-এর পবিত্র মাজারের শীর্ষস্থানীয় খাদিম হতে বর্ণনা করেছেন যে, একটি যিয়ারতি ক্বাফেলা তাঁকে বলেছে যে, ইমাম হোসায়েন (আঃ)-এর যিয়ারতের জন্য আমি আমার স্ত্রীসহ কাফেলার সাথে ইরান থেকে রওনা হই। আমার স্ত্রীর অসুস্থতার কারণে তারা আমাকে ক্বার্নাত্বীনা নামক স্থানে ছেড়ে অগ্রসর হয়ে যায়। যেখানে আমার স্ত্রী সন্তান প্রসব করার সময় মারা যায়। স্ত্রীর কাফন-দাফন শেষে নবজাতক শিশুটিকে সঙ্গে নিয়ে আমি সেখান থেকে রওনা হয়ে যাই। কারণ এলাকাটি আহলে সুন্নাতের সাম্প্রদায়িক এলাকা হওয়ায় কোনো ধাত্রীর ব্যবস্থা করা যায়নি। আর শিশুটিও নবজাতক ছিল এবং স্তন ছাড়া অন্য কিছু গ্রহণ করছিল না। সে চিৎকার করে করে কাঁদছিল। যতই সান্ত্বনা দেওয়ার চেষ্টা করছিলাম, ততই সে কাঁদছিল। শেষ পর্যন্ত, আমি ভাবলাম যে, এই টুকু বাচ্চা একটি খালি স্তন এবং একটি দুধে পূর্ণ স্তনের মধ্যে কি পার্থক্য করতে পারবে? এই ভেবে আমি ওকে শান্ত করার জন্য আমার স্তন ওর মুখে দেওয়ার চেষ্টা করলাম। বাচ্চাটাও সেটা মুখে নিয়ে চুষতে লাগলো এবং শান্ত হয়ে গেল কিছুক্ষণ পর যখন ভালো করে দেখলাম তখন দেখা গেল ওর মুখ দিয়ে কিছু একটা বের হচ্ছে। আমি আমার স্তন থেকে শিশুর মুখ সরিয়ে নিলাম এবং অবাক

---

[1] *দাস্তানহায়ে শেগুফৎ, পৃঃ ১৬৪।*

হয়ে লক্ষ্য করলাম যে আমার স্তন থেকে দুধ প্রবাহিত হচ্ছে। আমি নিশ্চিত যে, ইমাম হোসায়েন (আঃ) তাঁর অনুগ্রহে তার ছোট্ট যিয়ারতকারীর জন্য রিজিক্বের ব্যবস্থা করেছেন। এই প্রক্রিয়া কাযমাইন ও সামার্রায় চলতে থাকে যতক্ষণ না আমি শিশুটিকে নিয়ে কারবালায় পৌঁছাই। সেখানে আমি যখন আমার স্তন বাচ্চার মুখে দিলাম, এখন আমার স্তন থেকে দুধ প্রবাহিত হওয়া বন্ধ হয়ে গিয়েছিল। আমি বুঝতে পেরেছিলাম যে, এই রিযক্বের ব্যবস্থা এই জন্য ছিল যে, পথিমধ্যে কোনো গ্রহণযোগ্য এবং নির্ভরযোগ্য ধাত্রী পাওয়া সম্ভব ছিল না। এখন কারবালায় যেহেতু একজন খাঁটি ও প্রেমময় ধাত্রী পাওয়া সম্ভব, তাই এখন দুধ প্রবাহিত হওয়া বন্ধ হয়ে গিয়েছে, আর ধাত্রীরও ব্যবস্থা হয়ে যায়।[1]

পাঠকগণ! আপনারা লক্ষ্য করলেন? হযরত ইমাম হোসায়েন (আঃ) তাঁর প্রত্যেক যিয়ারতকারীকে ঠিক তেমনি যত্ন নেন যেমন তিনি জীবদ্দশায় তাঁর মান্যকারীদের যত্ন নিতেন। পবিত্র ও নিষ্পাপ ইমামগণ তাঁদের যিয়ারতকারীদের এমন যত্ন নেন সম্ভবতঃ পৃথিবীর মানুষ তাদের মেহমানদের এতটা যত্ন নিতে পারবে না। অতএব, পথের অসুবিধার কথা চিন্তা না করে যিয়ারতের পরিকল্পনা করা উচিত এবং এটি পিতামাতা এবং সন্তান উভয়ের জন্য ইহকাল ও পরকালের সুখের জন্য সর্বোত্তম বিনিয়োগ। শিশুদেরকেও নিজেদের সাথে যিয়ারতে নিয়ে যাওয়া উচিত। আল্লাহ রাব্বুল আলামীন আমাদের সকলকে যত শীঘ্র সম্ভব আমাদের পিতা-মাতা ও স্ত্রী-সন্তানসহ পবিত্র ও নিষ্পাপ ইমামগণের যিয়ারতের তৌফীক্ব দান করুন, আমীন ইয়া রব্বাল আলামীন।

তৃতীয় ঘটনা

জনাব সোলায়মান ইবনে আ'মাশ হতে একটি রেওয়ায়েত বর্ণিত হয়েছে, তিনি বর্ণনা করেন যে, কুফায় আমার এক প্রতিবেশী ছিল আমি তাকে একদিন জিজ্ঞাসা করলাম আপনি কেন ইমাম হোসায়েন (আঃ)-এর যিয়ারত করতে যান না? জবাবে তিনি বললেন: (নাউযুবিল্লাহ মিন যালিক অর্থাৎ তা থেকে আল্লাহর আশ্রয় চাই) কারণ তা হলো একটি বিদআত কাজ, আর প্রতিটি বিদআতই গোমরাহী এবং যে ব্যক্তি তা করে সে জাহান্নামী। তার কাছ থেকে এসব শুনে আমি সেখান থেকে উঠে নিজের ঘরে চলে আসি। শুক্রবার রাতে ভাবলাম সকালে গিয়ে এই প্রতিবেশীকে হযরত ইমাম হোসায়েন (আঃ)-এর ফযীলত ও মর্যাদা ও সম্মানের হাদীস শোনাবো যাতে তার ভুল ভেঙে যায় এবং সে সঠিক পথের পথিক হয়ে যায়। পরের দিন আমি যখন তার বাড়িতে পৌঁছালাম, তখন পরিবারের সদস্যরা আমাকে জানায় যে, সে গত রাতে ইমাম হোসায়েন (আঃ)-এর যিয়ারত করতে কারবালায় গিয়েছে। আমি অবাক হলাম এবং দ্রুত প্রস্তুত হয়ে কারবালার উদ্দেশ্যে রওনা হলাম। সেখানে পৌঁছে দেখলাম যে, তিনি রুকু-সেজদায় মগ্ন (অর্থাৎ নামায পড়ছে) এবং পথের ক্লান্তির ভাব তার মধ্যে মোটেও লক্ষ্য করা যাচ্ছে না। আমি তাকে জিজ্ঞাসা করলাম যে, তুমি তো ইমাম হোসায়েন (আঃ)-এর যিয়ারতের বিষয়ে আমাকে খারাপ কথা শুনিয়ে ছিলে? তিনি উত্তর দিলেন: বন্ধু আমার! তুমি সত্য কথা বলছো, তখন পর্যন্ত এটাই আমার বিশ্বাস ছিল। গত রাতে (শুক্রবার রাতে) আমি স্বপ্নে দেখলাম যে, রসূলুল্লাহ (সঃ), আমীরুল মো'মেনীন হযরত আলী (আঃ), সকল নবী-রসূল ও সকল ইমামগণ, ইমাম হোসায়েন (আঃ)-এর যিয়ারত করতে এসেছেন, আর তাঁদের সাথে একটা আমারী[2]ও রয়েছে আমি জিজ্ঞাসা করলাম এই আমারীর মধ্যে কে রয়েছে? উত্তর পেলাম যে, হযরত ফাতেমা যাহরা (সাঃ) তাঁর পুত্রের যিয়ারতে এসেছেন। আমি আমারীর কাছে গিয়ে দেখলাম তার মধ্য থেকে অনর্গল কাগজের চিরকুট বেরিয়ে আসছে। আমি চিরকুট সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করলাম এবং উত্তর পেলাম যে, এই চিরকুটটি ইমাম হোসায়েন (আঃ)-এর যিয়ারতকারীদের জন্য শবে জুমা (জুমার রাতে) আল্লাহর শাস্তি থেকে নিরাপত্তার

---

[1] *কিতাব দারুস সালাম ইরাক্বী, পৃঃ ৫০৬*

[2] *বাহনের পিঠে নারীদের বসার জন্য ঘেরা স্থান।*

চিরকুট। আর সেই সময় আমি ঘোষকের ঘোষণাও শুনলাম, এই বলে ঘোষণা করছে যে, আমরা ও আমাদের শিয়ারা (অনুসারীরা) জান্নাতের উচ্চস্তরে অবস্থান করবো। আমি জিজ্ঞাসা করলাম, এরা কারা? উত্তর আসলো: এঁরা হলেন মহানবী (সঃ), সকল নবীগণ ও পবিত্র ও নিষ্পাপ ইমামগণ। আমি যখন এই দৃশ্যগুলো প্রত্যক্ষ করছিলাম, তখনই আমি ঘুম থেকে জেগে উঠলাম, এখানে এসে অনুতপ্ত সহকারে তওবা করলাম এবং কেঁদে কেঁদে নিজেকে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ করলাম যে, যতদিন আমি বেঁচে থাকবো ততদিন আমি এই নেক আমল থেকে গাফেল হবো না। সোলায়মান ইবনে আ'মাশ বলেন: আমিও তার জন্য অনেক দোয়া করলাম এবং বিদায় নিয়ে ঘরে ফিরে এলাম।[1]

প্রিয় পাঠকবর্গ! দেখেছেন? আজও রসূলুল্লাহ (সঃ)-এর মহামূল্যবান এই হাদীসটি "ইন্নাল-হোসায়না মিসবাহুল হুদা ওয়া সাফীনাতু নাজাহ্-নিশ্চয় হোসায়েন হেদায়েতের প্রদ্বীপ ও নাজাতের তরী" যিয়ারত অস্বীকারকারীদের মধ্যে যিয়ারতের আকাঙ্ক্ষা তৈরি করে দেয়।

তাই শুক্রবার রাতে আমাদের পূর্বপুরুষেরা (আল্লাহ তাঁদের প্রতি রহম করুন) মজলিসের আয়োজন ও যিয়ারতে ওয়ারেসাহ্ পাঠ করার তাগিদ দিয়েছেন। সর্বশক্তিমান আল্লাহর কাছে প্রার্থনা করি যেন তিনি আমাদেরকে আমাদের স্ত্রী-সন্তান এবং পিতা-মাতার সাথে আজীবন যিয়ারত করার তৌফীক্ব দান করেন, আমীন ইয়া রব্বাল আলামীন।

চতুর্থ ঘটনা

বর্ণিত আছে যে, মসুল শহরে একজন হেকিম (চিকিৎসক) থাকতেন যিনি ইমাম হোসায়েন (আঃ)-এর সময় শুধু হযরতের ইমামতিতে বিশ্বাসী ছিলেন তা নয়, বরং তিনি হযরতের পরীক্ষা নেন এবং পরে তিনি হযরতের ইমামতিতে বিশ্বাসী হন। তিনি বর্ণনা করেন যে, আমার পাড়ায় এক বিধবা থাকতেন যিনি হযরত ইমাম হোসায়েন (আঃ)-কে ভালোবাসতেন, তিনি অসুস্থ হয়ে পড়লে তিনি তাঁর এতীম সন্তানকে আমার কাছে পাঠান। আমি তাঁর সন্তানের মুখে বিত্যান্ত শুনে বললাম, ওষুধ আমি বানিয়ে দিচ্ছি তিনি সুস্থও হয়ে উঠবেন। তবে এর জন্য আমার অমুক রঙের ঘোড়ার সম্পূর্ণ তাজা লিভার কলিজি চাই। সে বেচারা ক্ষমা চাইলো যে, আমি কোথায় পাবো? তখন আমি (হেকিম) বললাম, তোমার ওস্তাদ ইমাম হোসায়েন (আঃ)-এর কাছে গিয়ে চাও, দেখো তিনি তোমাকে সাহায্য করতে পারেন কি না? ছেলেটি হযরত ইমাম হোসায়েন (আঃ)-এর নিকট গিয়ে তার আবেদন রাখলো। হযরত অবিলম্বে সেই রঙের একটি ঘোড়া আনার আদেশ দিলেন, তাঁর সামনে জবাই করে তার কলিজি বের করে দিয়ে দিলেন। এতীমটি তা আমার কাছে নিয়ে আসলো, আমি আশ্চর্য হলাম, কিন্তু আমি তাকে পরপর পাঁচবার বিভিন্ন গুণ ও মানের ঘোড়ার কলিজি আনতে বললাম এবং সে ইমাম হোসায়েন (আঃ)-এর কাছ থেকে একের পর এক সব নিয়ে আসে। আমি খুবই বিস্মিত হলাম এবং এই উদারতায় এতটাই মুগ্ধ ও প্রভাবিত হলাম যে, আমি এই এতীমকে নিয়ে হযরত ইমাম হোসায়েন (আঃ)-এর খেদমতে হাজির হলাম এবং তাঁর কদমে নিজেকে ফেলে দিলাম। তাঁর ইমামতে বিশ্বাসী হয়ে গেলাম। তখন হযরত ইমাম হোসায়েন (আঃ) আমাকে সেই স্থানে নিয়ে গেলেন যেখানে পাঁচটি ঘোড়ার মৃতদেহ পড়ে ছিল। আমাকে সম্বোধন করে তিনি বললেন, এটা তো তবুও অনেক সহজ বিষয় ছিল, আমি তোমাকে এর চেয়েও উত্তম আমলের কথা বলছি শোনো! ইমাম হোসায়েন (আঃ) এই ঘোড়াগুলোর লাশের পাশে দাঁড়িয়ে আকাশের দিকে হাত তুলে বললেন: হে প্রতিপালক! তোমার ইচ্ছানুযায়ী এই ঘোড়াগুলোকে তোমার এক বান্দার জন্য জবাই করা হয়েছে। আর তুমি এদের সকলকে পুনরায় জীবিত করতে সক্ষম। তাই যদি আমার বাপ-দাদা ও পূর্বপুরুষগণ তোমার দৃষ্টিতে সম্মানিত হয়ে থাকেন,

পরবর্তী অংশ ৮ নং পৃষ্ঠায় দেখুন

[1] *তোহফাতুল মাজালিস, পৃঃ ২১২।*

নাজাতের বিন্দু

আজ থেকে কয়েক হাজার বছর আগে যখন এই পৃথিবীতে মানবতার বৃক্ষ জন্মেছিল। যার শাখা-প্রশাখা মাটিতে নয় বরং আকাশের সাথে সংযুক্ত ছিল, হেদায়েত ও পথ-প্রদর্শনের সেই বৃক্ষ যাকে প্রতিপালক সমস্ত সৃষ্টির জন্য ছায়ারূপে ঘোষণা করেছিলেন। তাঁরা ছিলেন নবী-রসূলগণ (সঃ)। আর এটাই ছিল সেই পরম্পরা বা শৃঙ্খল যা হযরত আদম (আঃ)-এর মাধ্যমে শুরু হয়েছিল। আর সেই বৃক্ষের ছায়াতলে আদম-সন্তানদের মুক্তির তরণীটির সফর জারি থাকার কথা ছিল। তাই হযরত আদম (আঃ) থেকে নিয়ে হযরত খতম (বিশ্বনবী সঃ-) পর্যন্ত সকলেই সর্বাত্মক চেষ্টা করেছেন এবং মানুষের মুক্তির পথ সুগম, প্রশস্ত ও স্পষ্ট করতে থেকেছেন।

বিন্দু শব্দের আভিধানিক অর্থ হলো অতি স্বল্পমাত্রা, যার পরিব্যাপ্ত হওয়ার ক্ষমতা নেই অন্য কিছুর সাথে মিলিত না হওয়া অবধি। অর্থাৎ তার নিজের অস্তিত্ব সংক্ষিপ্ত ও সংকীর্ণ, কিন্তু যখন সে কারো সাথে সংযুক্ত হয়, তখন সে তার অবস্থার পরিবর্তন ঘটায়।

আর নাজাত কী? কেন তা স্থাপন করা হয়েছে? উল্লেখ্য যে, যখন মানুষকে পৃথিবীতে পাঠানো হয়েছিল, তখন এই ব্যক্তির সাথে আদুউম্মুবীন-প্রকাশ্য শত্রু নামে অতি পরিচিত আরেকজন সত্ত্বা উপস্থিত ছিল। যে তার কুমন্ত্রণার অস্ত্র ব্যবহার করা শুরু করে দেয় এবং তার প্রবঞ্চনার কারণে হযরত আদম ও হযরত হাওয়া (আঃ)-কে জান্নাত থেকে বহির্জগতে বের হতে হয়।

পাক পরওয়ারদেগার তাঁর সৃষ্টিকে খুব ভালোবাসেন, তাই তিনি তাদের শাস্তি দিতে পছন্দ করেন না। তিনি জান্নাত ও জাহান্নাম সৃষ্টি করেছেন বটে, কিন্তু তাঁর অভিপ্রায় এটাই ছিল যে, আমার সমস্ত বান্দা যেন মুক্তি পায় এবং জান্নাত যেন তাদের চিরস্থায়ী আবাস হয়। কিন্তু তিনি এটাও জানতেন যে, এই "আদুউম্মুবীন" অর্থাৎ ইবলিস শয়তান এবং ইবলিশের দালালরা কখনোই এর সুগন্ধ নিতে পারবে না, আর নিজেদের সাথে সাথে অন্যদেরকেও এর থেকে দূরে সরিয়ে নিয়ে যাবে। অতএব, এটা আল্লাহর বিশেষ অনুগ্রহ ছিল যে, তিনি ইবলিসের অনিষ্ট থেকে বান্দাদেরকে বাঁচানোর জন্য ত্রাণকর্তা অর্থাৎ নবী-রসূলগণকে প্রেরণ করেছেন।

উক্ত মুক্তিদানের সফরে নবী-রসূল ও পবিত্র ইমামগণ কঠোর পরিশ্রম করেছেন এবং অনেক কষ্ট সহ্য করেছেন। তাঁরা মানুষকে আল্লাহর এবাদতের দিকে আকৃষ্ট করেছেন, আল্লাহর সন্তুষ্টি ও অসন্তুষ্টি মানুষের সামনে পেশ করেছেন, যা অনুসরণ করে মানুষ আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জন করতে পারে এবং মৃত্যু থেকে রক্ষা পেতে পারে তার সন্ধান দিয়েছেন।

মুক্তিদানের এই যাত্রায় হুজ্জাতে খোদাগণ পাথর খেয়েছেন, মানুষের অত্যাচার সহ্য করেছেন, আগুনে নিক্ষিপ্ত হয়েছেন, কারাবাসের কষ্ট সহ্য করেছেন, ক্ষুধা সহ্য করেছেন, নিহত হয়েছেন, কিন্তু একটাই লক্ষ্য ছিল যে, মানুষ যেন হেদায়েত পায়, তাদের হৃদয়ে আল্লাহর দ্বীন স্থাপিত হয় এবং তারা যেন সফল হয়।

পূর্ববর্তী সকল নবী (সঃ) দ্বীনের প্রচারে যে কঠোর পরিশ্রম করেছিলেন, নবীদের সর্দার এসে তা একত্রিত করে একটি পরিপূর্ণ দ্বীন হিসাবে দ্বীনে ইসলাম আকারে বিশ্ববাসীর সামনে পেশ করেছেন, ক্বোরআনের দৃষ্টান্তে যা আল্লাহ পছন্দসই ও প্রিয় দ্বীন। স্বয়ং নবীপাক (সঃ)-এর মেহনত ও পূর্ববর্তী সকল আম্বিয়াগণের পরিশ্রমের নির্যাস ও সারমর্ম হলো এই দ্বীনে ইসলাম।

গাদীরের ঘোষণার পর, লোকেদের উপরে দায়িত্ব পূরণ হয়ে গিয়েছিল যে, দ্বীন সম্পূর্ণ হয়ে গিয়েছে এবং রসূলুল্লাহ (সঃ) যে শিক্ষা-দীক্ষা তিনি দিয়েছেন কেবল সেগুলোই দ্বীনের অংশ, আর যারা তা অনুসরণ করবে কেবলমাত্র তারাই মুক্তিপ্রাপ্ত হতে পারে। সুতরাং এখন সকল শাখাগত বিষয় কেবলমাত্র এই শর্তে গ্রহণ করা হবে যে, সেগুলো রসূলুল্লাহ (সঃ) ও ক্বোরআনের বাণী অনুসারে হবে। তাহলে আমরা যে বিষয়ের কথা বলছি, তাতে নাজাত বা মুক্তি সম্ভব হবে।

এখন আসুন আমরা একটু অন্য প্রান্ত থেকে দেখি যে, নবী করীম (সঃ)-এর পর এক লক্ষ চব্বিশ হাজার নবীগণের হাজার হাজার বছরের পরিশ্রমের কি অপব্যবহার শুরু হয়ে যায়নি? একটু একটু করে, সেই প্রকাশ্য শত্রু শয়তান দ্বীনকে ভিতর থেকে ভঙ্গুর করতে আরম্ভ করেনি কি? আর এভাবে মানুষ আল্লাহর আনুগত্য ও অবাধ্যতার পার্থক্য ভুলে যেতে বসেছিল। আর কেন এমনটা হতো না? রসূলুল্লাহ (সঃ)-এর প্রকৃত উত্তরসূরীকে বাদ দিয়ে দ্বীন অর্জনের নিয়ম প্রচলিত হয়ে গিয়েছিল। দ্বীন রাস্তা-ঘাটে নিলাম হচ্ছিল। ইসলামের ক্ষমতাসীনরা সম্পদ ও ক্ষমতার জন্য ক্ষুধার্ত হয়ে পড়েছিল। আর ইসলামের প্রকৃত রক্ষাকারী ও অভিভাবকদের আটক করা হয়েছিল। যেন পরিত্রাণের পথ অসম্ভব ও অজানা হয়ে গিয়েছিল। এমন পরিবেশে কি পরিত্রাণ পাওয়া যেত যেখানে মানুষের হৃদয় মিথ্যা, চুরি, নিষ্ঠুরতা, অধিকার হরণ এবং আরও অনেক কিছুতে ভরে গিয়েছিল? এই ধরণের পরিবেশ ও পরিস্থিতিতে, একটি নির্দিষ্ট অঞ্চলকে আলোকিত করার জন্য কি নির্দেশনার একটি একক রশ্মি যথেষ্ট ছিল? নাকি এই মহাবিশ্বকে আলোকিত করার জন্য এবং শুধুমাত্র আলোকিত করার জন্য নয়, মিথ্যা উপাসকদের চোখকে আলোকিত করার জন্য এবং যারা অন্ধকার থেকে পরিত্রাণ কামনা করে তাদের রক্ষা করার জন্য কি সমগ্র রশ্মি ও কিরণ প্রয়োজন ছিল না?

যে আলো ও রশ্মির ঔজ্বল্য মিথ্যুকদের ও বাতিল পন্থিদের ঝলসে দেবে আর সৎ ও সৎপন্থিদের অন্তরকে সুশীতল করে তুলবে সেই ব্যক্তি ও সেই নাজাতের তরী হলেন ইমাম হোসায়েন (আঃ)। যিনি এযীদের মতো পাপিষ্ঠ ও অভিশপ্ত যে ইবলিসের দ্বীনকে দ্বীনে ইসলামের স্থানে স্থাপন করার পূর্ণ প্রস্তুতি নিয়ে নিয়েছিল, তাকে নাস্তা-নাবুদ করার জন্য প্রস্তুত ছিলেন।

এখন একদিকে ছিল সকল নবী-রসূলগণের মেহনত, যার উত্তরাধিকারী ছিলেন ইমাম হোসায়েন (আঃ), অর্থাৎ যে ব্যক্তি হযরত আদম (আঃ), হযরত ইব্রাহীম (আঃ), হযরত নূহ (আঃ) এবং রসূলুল্লাহ (সঃ) এবং অন্যান্য সকল আম্বিয়াগণের মেহনত ও কাজ দেখতে চাইতো সে নির্দিধায় ইমাম হোসায়েন (আঃ)-কে দেখে নিতে পারতো। তিনি যেন সকল আম্বিয়াগণের পরিশ্রমের মূর্ত প্রতীক ছিলেন। যে সকল নবীগণ নাজাতের জন্য এসেছিলেন, যাঁদের অস্তিত্বই ছিল আল্লাহর স্মরণের কারণ, আর তাঁদের মূর্ত প্রতীক ছিলেন হযরত ইমাম হোসায়েন (আঃ)।

যদি ইমাম হোসায়েন (আঃ) সে সময় নিজেকে এবং তাঁর পরিবার-পরিজন ও সঙ্গীদের কুরবানী না দিতেন, তাহলে সেই অন্ধকার আচ্ছন্নকারী মেঘগুলো যেগুলো ক্রমশ ঘনীভূত হচ্ছিল, সেগুলো অন্ধকারের সাগরে মিলিত হয়ে এমন এক বন্যার সৃষ্টি করতো যে, বিশ্ব মানবতা তলিয়ে যেতো।

ইমাম হোসায়েন (আঃ)-এর কুরবানী দেওয়ার সাথে সাথে শয়তানবাদের উপাসনালয়ে যারা মাথা নত করেছিল, তাদের মাথা আল্লাহর ঘরের দিকে ফিরে গিয়েছিল। যে কলমগুলো সত্যকে মিথ্যা আর হককে বাতিল হিসাবে চিহ্নিত করছিল ইমাম হোসায়েন (আঃ)-এর পবিত্র রক্তের ফোয়ারা সেগুলো মুছে ফেলেছিল। অতঃপর **১১**ই মহর্রমে দিগন্তে যে সূর্য আবির্ভূত হয়েছিল তা বলে দিচ্ছিল যে, ইমাম হোসায়েনই মুক্তির তরণী।

এখন আমরা আমাদের শিরোনামের প্রতি পাঠকদের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চাই যে, নাজাতের সেই ফোঁটা বা বিন্দু, অর্থাৎ মাওলা ও আক্বা শহীদ সম্রাট ইমাম হোসায়েন (আঃ)-এর শোকে অশ্রুর যে বিন্দুটি বেরিয়েছে প্রকৃতপক্ষে সেই এক বিন্দু অশ্রুর পিছনে মুক্তির এক বৃহত্তর বিশ্ব লুকিয়ে রয়েছে।

কান্নাকাটি করা, বিলাপ করা একটি সত্য অনুভুতি, আল্লাহর পক্ষ থেকে দেওয়া প্রকৃতির একটি আলো। যখন একটি শিশু কাঁদে, তখন বাবা-মা বুঝতে পারেন যে, তার কোনো কিছুর প্রয়োজন বা সমস্যা আছে। কান্না যেহেতু এক প্রাকৃতিক প্রয়োজন, সেহেতু বুদ্ধি-বিবেক যত বৃদ্ধি পায় ও পরিপক্ক হয় ততই বুঝতে শুরু করে যে, কখন কাঁদতে হবে এবং কেন কাঁদতে হবে। অত্যাচারী কখনো কাঁদে না এবং তার জন্যও কেউ কাঁদে না। কেউ যদি জালিমের জন্য কাঁদে তাকেও জালিম

ভাবা হবে। কিন্তু মজলুম বা অত্যাচারিত নিজে কাঁদে এবং ন্যায়পরায়ণ এবং বিবেকবান মজলুমের জন্য অশ্রু ঝরায়।

সুতরাং সেই অশ্রুই একটি গোটা জাতি গঠন করেছে এবং ধার্মিকতার ও সত্যের প্রাসাদ তৈরি করেছে, যার ভিত্তি ক্বেয়ামত পর্যন্ত নড়ানো যাবে না। আর সেই অশ্রুই প্রমাণ করেছে যে, কে নির্যাতনকারী আর কে নির্যাতিত, কে দ্বীনের রক্ষক, আর কে দ্বীনের প্রতিপক্ষ?

রসূল (সঃ)-এর বাণীর সত্যতা ঘোষণাকারী একটি জাতির জন্ম হয়। যে জাতি সংখ্যা অত্যন্ত লঘু কিন্তু তারা সর্বদা ক্রন্দনরত থাকে সত্যের জন্য হকের জন্য। তারা ক্রন্দন করতে থেকেছে তখন যখন রসূল (সঃ)-এর প্রাণের টুকরো ফাতেমা যাহরার পবিত্র ঘর পুড়িয়ে ফেলা হয়েছে এবং যে দুর্বিসহঃ ঘটনার কারণে তাঁর শাহাদত হয়ে গিয়েছে। মহানবী (সঃ)-এর পরে যিনি মাত্র ৭৫ দিন অথবা ৯০ দিন বেঁচে ছিলেন। যে জাতি সংখ্যায় খুবই কম ছিল সেই জাতি কি বিলীন হয়ে গেল নাকি বেড়ে গেল? ইতিমধ্যে রসূল (সঃ)-এর প্রতিনিধি কুফার মসজিদে শহীদ হয়ে গেলেন। এটাই ছিল প্রথম সত্যের ঘোষণা যে, এই জাতি বাড়তেই থাকবে, কখনো হ্রাস পাবে না। এই জাতির চোখ থেকে যে অশ্রু ঝরছিল তা নদীর উৎস হয়ে উঠছিল। ইমাম হাসান (আঃ)-এর জানাজায় তীর নিক্ষেপ করা হয়েছিল। তাঁর কলিজা ৭২টি টুকরো হয়ে একটি পাত্রে জমা হয়েছিল। তাঁকে তাঁর নানাজানের কবরের পাশে দাফন করতে দেওয়া হয়নি। সেই জাতির চোখ থেকে যে অশ্রুর নদী প্রবাহিত হয়েছিল, তার ঝর্ণা পর্বতের সীনা বিদীর্ণ করে বন্যায় রূপ নিয়ে আরবের উপত্যকায় প্রবাহিত হতে লাগল। এ নদীর বন্যা কারবালার পর থেমে না গিয়ে অবিশ্বাস ও গোমরাহীকে পদদলিত করে ঈমানের উপত্যকাগুলোকে সেচ দিতে থাকে, যা বিশ্বনবীর ভবিষ্যদ্বাণীর সত্যকে বিশ্বের কোণায় কোণায় ছড়িয়ে দেয় এবং মুক্তির ঘোষণা দেয়।

সেই এক বিন্দু অশ্রু যা শোক ও দুঃখের কারণে বয়ে যায়, তা এক মুহূর্তে চোখ ছেড়ে গালে এসে পৌঁছায়, আর এই জাতি সেই এক মুহূর্তে লাখো নবীর পরিশ্রম অনুভব করতে সক্ষম হয়। তারা সেই ক্বুরবানীকেও বুঝতে পারে যা ইমাম হোসায়েন (আঃ) পেশ করেছেন। যে দ্বীনের জন্য ইমাম হোসায়েন (আঃ) তাঁর এবং তাঁর পরিবারের ও সঙ্গীদের জীবন উৎসর্গ করেছিলেন তার গুরুত্ব অনুধাবন করতে সক্ষম হয়। সেই একটি ফোঁটা এত বিশুদ্ধ যে খুব কমই কোনো উপাসনা এতো আন্তরিক হতে পারে।

পক্ষান্তরে খোদার দ্বীন রক্ষার জন্য ইমাম হোসায়েন (আঃ) সর্বস্ব বিসর্জন দিয়ে তাঁর প্রকৃত ধর্ম মানুষের কাছে প্রকাশ করে দিয়েছিলেন, তাহলে মহান আল্লাহ তায়ালা তাঁর জন্য বিসর্জিত এক বিন্দু অশ্রুও কেন বৃথা যেতে দেবেন?

অতএব, ইমাম হোসায়েন (আঃ)-এর কষ্টের উপর প্রবাহিত এক ফোঁটা অশ্রুর বিনিময়ে সমগ্র বিশ্বজগতকে নাজাত দেওয়া আল্লাহর প্রভুত্বের দাবি। কারণ ইমাম হোসায়েন (আঃ) কারবালা থেকে ক্বেয়ামত পর্যন্ত মানুষের হৃদয়ে একটি ঘটনা লিপিবদ্ধ করেছেন যে, যে দ্বীনের অনুসরণ করে সফলতা অর্জন করতে হবে তা ইমাম হোসায়েন (আঃ)-এর পথেই পাওয়া যাবে। তাই কান্নার সওয়াব এবং কান্নার গুরুত্ব যেভাবে অন্তরকে পরিশুদ্ধ করে এবং দ্বীনের গুরুত্ব তুলে ধরে, আর যে মহব্বত নবুওয়াতের পারিশ্রমিক স্বরূপ তা বৃদ্ধির কারণ হয়।

এ কারণেই বিশেষ করে যে গ্রন্থাদি কারবালার ইতিহাস বা ইমাম হোসায়েন (আঃ)-এর বিষয়ে লেখা হয়েছে সেখানে এই রেওয়ায়েতগুলো সাধারণভাবে পাওয়া যায়। যেমন শেখ জাফর শুস্তারী নিজ গ্রন্থ খাসায়েসুল হোসায়নিয়া-এর মধ্যে কান্নার আটটি ফযীলত বর্ণনা করেছেন। যার মধ্যে আমরা পাঁচটি বর্ণনা করছি:

১- কান্না হলো আল্লাহর রসূলের সাথে সদ্ব্যবহার করার মতো।

২- শহীদ সম্রাট ইমাম হোসায়েন (আঃ)-এর জন্য কাঁদা যেন সিদ্দিক্বা কুবরা ফাতেমা যাহরা (সাঃ)-এর প্রতি শোক ব্যক্ত করা, কারণ তিনি তাঁর

নির্যাতিত পুত্রের জন্য প্রতিদিন কাঁদেন। হযরত ইমাম জাফর সাদিক্ব (আঃ) বলেন: আপনি কি হযরত ফাতেমার আনসারদের মধ্যে গণ্য হতে চান না?[1]

৩- এতে কোন সন্দেহ নেই যে, কান্না নবী (সঃ) ও তাঁর বংশধারার ইমামগণের হক আদায় করা। আর রেওয়ায়েতগুলোও তার সমর্থন করে, যেখানে বলা হয়েছে যে, আমাদের দুঃখ-কষ্টে ও শোক-দুঃখে কাঁদা মানে আমাদের হক পরিশোধ করা।

৪- ইমাম হোসায়েন (আঃ)-এর জন্য ক্রন্দন করা প্রত্যেক যুগে তাঁকে সাহায্য করার মতো।

৫- ইমাম হোসায়েন (আঃ) ও আহলেবায়তের জন্য কান্না হলো উসওয়ায়ে হাসানাহ্ বা উত্তম চরিত্র, আর পূর্ববর্তী সকল নবীগণ ও ফেরেশতাগণের এবং আল্লাহর বিশিষ্টজনদের অনুসরণ করার মতো।

হযরত ইমাম মোহাম্মাদ বাক্বের (আঃ) বলেন: প্রত্যেক সেই মোমিন যে ইমাম হোসায়েন (আঃ)-এর হত্যাকাণ্ডে অশ্রু ঝরাবে আর সেই অশ্রু তার মুখমণ্ডলে প্রবাহিত হবে, আল্লাহ তাকে জান্নাতে স্থান দান করবেন এবং সে সেখানে চিরকাল থাকবে।[2]

প্রতিটি ক্রিয়াকলাপের জন্য একটি সীমা নির্ধারণ করা হয় তার থেকে কমে ক্রিয়াটি গৃহীত হওয়ার সম্ভাবনা থাকেনা । কিন্তু ইমাম হোসায়েন (আঃ)-এর জন্য ক্রন্দন করা এমন একটি কাজ যার কোনো সীমা নির্ধারিত নেই, যত স্বল্প হোক বা বেশি। একইভাবে এই কাজের জন্য যে সওয়াব প্রদান করা হয় তারও কোনো সীমা নেই। এমন কি যে ব্যক্তি কাঁদছে তার চোখ থেকে যদি অশ্রু প্রবাহিত নাও হয়, কিন্তু সে যদি নিজ চেহারা কান্নারত ব্যক্তির চেহারার মতো করে তবে তার জন্যও একই সওয়াব নির্ধারিত। এই বিষয়টি অত্যন্ত বিস্ময়কর। বর্ণনায় এমন ব্যক্তির জন্য ফা-তাবাকা শব্দটি ব্যবহার করা হয়েছে। অর্থাৎ যিনি কাঁদার মতো চেহারা করেন। কাঁদে না কিন্তু বিপন্ন ও বিধ্বস্তের মতো মাথা নিচু করে কান্নার আওয়াজ তোলে এবং দুঃখের ভাব প্রকাশ করে, এমন ব্যক্তিও সওয়াবে সমানভাবে অংশীদার।

এখানে আমরা আমাদের বিষয়বস্তুতে এক ফোঁটা অশ্রু নিয়ে আলোচনা করেছি, কিন্তু রেওয়ায়েতে কান্নার মতো ভাব প্রকাশ করাকেও সমান সওয়াব দেওয়া হয়েছে। সকল নবী ও ইমামগণও এই বিষয়টিতে শরীক রয়েছেন। স্বয়ং যুগের ইমাম (আঃ) দিনরাত কান্নায় মগ্ন থাকেন, কেননা, আল্লাহর দ্বীনের রক্ষার্থে প্রবাহিত প্রত্যেকটি রক্ত-বিন্দুর জন্য কান্না রয়েছে, আর যেটি আল্লাহর অত্যন্ত প্রিয়ও। প্রকৃতপক্ষে এই সওয়াবের কারণ হলো আল্লাহর বিশুদ্ধ সন্তুষ্টিতে অন্তর্ভুক্তি। যার কারণে এই সওয়াব পাওয়া যাচ্ছে।

হযরত ইমাম বাক্বের (আঃ) বলেছেন: যে ব্যক্তির চোখ থেকে ইমাম হোসায়েন (আঃ)-এর শোকে মাছির ডানার পরিমাণ অশ্রু ঝরবে তার সমুদ্রের ফেনা পরিমাণ গুনাহ হলেও আল্লাহ তায়ালা তা ক্ষমা করে দেবেন।[3]

সে অশ্রু এক বিন্দু হোক বা অনেক পরিমাণ, আর তাঁর শোকে অশ্রুবিগলিত কান্না হলো স্থায়িত্বের ধ্বনি , আর কান্নার ক্ষেত্রে মানদন্ড হলো আন্তরিক বিশুদ্ধতা। কেননা ইমাম হোসায়েন (আঃ)-এর জন্য বিশুদ্ধ অন্তরে বিসর্জন দেওয়া এক বিন্দু অশ্রু তার উভয় জগতের মুক্তির কারণ হয়ে যায়।

অশ্রুর স্থান যদিও মানুষের চোখযুগল কিন্তু তা প্রবাহিত হয় আল্লাহর আদেশে। সুতরাং এটি প্রমাণ হয়ে গেলো যে, যে ইমাম হোসায়েন (আঃ)-এর শোকে ক্রন্দন করে তার কান্নায় মহান রব্বুল আলামীনের সন্তুষ্টিও অন্তর্ভুক্ত রয়েছে। আর যে কাজ মহান রব্বুল আলামীনের সন্তুষ্টি সহকারে আঞ্জাম দেওয়া হবে তার বিনিময়ে কেন মুক্তি পাওয়া যাবে না? তা যতই স্বল্প হোক না কেন।

পরবর্তী অংশ ২৫ নং পৃষ্ঠায় দেখুন

---

[1] *বেহারুল আনওয়ার, খঃ ৪৫, পৃঃ ২০৮।*

[2] *বেহারুল আনওয়ার, খঃ ৪৪, পঃ ২৮৫।*

[3] *বেহারুল আনওয়ার, খঃ ৪৪, পৃঃ ২৯৩।*

'আর্বাঈনে' (চল্লিশায়) গ্র্যান্ড মুফতি আয়াতুল্লাহ সিস্তানী সাহেবের বার্তা

হযরত ওয়ালীয়ে আসর (আঃ)-এর গায়বতের যুগে তাঁর অনুসারীদের হেদায়েত ও পথপ্রদর্শনের দায়িত্ব মোজতাহিদে কেরামদের উপরে। প্রত্যেক যুগেই সৈয়্যেদুশ শোহাদা ইমাম হোসায়েন (আঃ)-এর আযাদারীর উপরে আপত্তি করা হতে থেকেছে, আযাদারীর গুরুত্বের উপরে প্রশ্ন উঠতে থেকেছে। কখনো সংশোধনের নামে, কখনো নেতিবাচক প্রভাবের নামে, কখনো অন্য কোনো স্বার্থে, কখনো অপব্যয় ও অপচয়ের নামে ওজর আপত্তি করা হয়েছে। আর এ কাজে তারা তো অগ্রণী ভূমিকা পালন করেছেই আহলে বাইত (আঃ)-এর সাথে যাদের কোন বিশেষ অনুরাগ নেই, সেই সাথে যারা আহলে বাইত (আঃ)-এর সাথে সম্পৃক্ত তারাও মন্তব্য করতে শুরু করেছে। তারা কখনো আযাদারী ও অশ্রুপাতের ছওয়াবের বিষয়ে আপত্তি করে, কখনো আযাদারীর আচার অনুষ্ঠানের সংশোধনের বিষয়ে কথা বলে, কখনো মাসায়েবে ইতিহাসের বিষয়ে কথা বলে। এরকম লোকেরা বন্ধুরূপে শোকপালনকারীদের সারিতে ঢুকে পড়ে মতভেদ ও মতানৈক্য সৃষ্টি করে দিয়ে নিজেদের এক বিশেষ পরিচয় স্থাপন করে। এভাবে যে আযাদারী জাতি-গোষ্ঠীকে একসূত্রে বেঁধে রাখার জন্য ছিল সেটিই তারা ভিন্নতার অস্ত্র হিসাবে ব্যবহার করে, আর এটিকেই তারা উম্মতের সংশোধনের নাম দেয়।

আমাদের সকলের মনে রাখা উচিত যে, ইমাম হোসায়েন (আঃ)-এর আযাদারী কোনো বে-ওয়ারিশ ও অভিভাবকহীন জিনিস নয়। মনে রাখতে হবে যে, ইমাম হোসায়েন (আঃ) হলেন ছারাল্লাহ (আল্লাহর রক্ত) তাই আল্লাহ তাঁর আযাদারীর রক্ষক ও প্রচারক। একই সাথে আল্লাহ তাঁর শেষ হুজ্জাত যিনি ইমাম হোসায়েন (আঃ)-এর পুত্র তাঁকে তাঁর প্রপিতা ইমাম হোসায়েন (আঃ)-এর আযাদারীর রক্ষক নিযুক্ত করেছেন। জনতা সাধারণভাবে দুই মাস আযাদারী পালন করে, কিন্তু হোসায়েন (আঃ)-এর সন্তান সারা বছর আযাদারী পালন করেন। আমরা তো ইমামের শোকে কেবল অশ্রুপাত করি, কিন্তু তিনি রক্তাশ্রু ঝরান। রক্তাশ্রু ঝরানো ইমামের জ্ঞান ও ভালবাসার উপর ভিত্তি করে। আল্লাহর দরবারে এবং আম্বিয়া ও আইম্মাগণের দৃষ্টিতে ইমাম হোসায়েন (আঃ)-এর যে মান-মর্যাদা ও সম্মান রয়েছে তা অনুধাবন করলে চোখ থেকে রক্তের অশ্রু প্রবাহিত হয়। আমাদের সেই মারেফাত নেই তাই আমার সাধারণ অশ্রুপাত করি। অতীত ও বর্তমান যুগের আপত্তিকারকদের যদি এই মহানুভবতা ও মর্যাদার কোনো ধারণা ও উপলব্ধি থাকত, তাহলে তারা আপত্তি করে শোকাহতদের মধ্যে ফাটল ও বিভেদ সৃষ্টি করতো না। শোক পালনের ক্ষেত্রে এ ধরণের ওজর-আপত্তি বিশেষ উল্লেখযোগ্য কিছু ফল বয়ে আনে না, তবে এর দ্বারা আপত্তিকারকদের উদ্দেশ্য অবশ্যই বোঝা যায়।

যাইহোক, প্রতিটি যুগে আযাদারী সম্পর্কিত প্রশ্ন আসতে থেকেছে এবং আলিম ও মোজতাহিদগণ তাদের উত্তর দিতে থেকেছেন। ইতিপূর্বে ফেক্বাহ শাস্ত্রবিদদের ওস্তাদ আয়াতুল্লাহ মির্জা নায়েনী (রহঃ)-এর নিকট এ সম্পর্কে প্রশ্ন করা হয়েছিল যার উত্তর তিনি দিয়েছিলেন। সেই সময় থেকে আজ অবধি মোজতাহিদগণ তাঁর উত্তরের সমর্থন করে আসছেন। তাঁদের অধিকাংশই এভাবে সমর্থন করে আসছেন যে, আমাদের গুরু ও শিক্ষক মহাশয় এ বিষয়ে যাকিছু বলেছেন তা সম্পূর্ণ সঠিক। সেই প্রশ্নোত্তরগুলোর উর্দু অনুবাদ বিভিন্ন বই-পুস্তকে রয়েছে মোমিনগণ অবশ্যই পড়ে নেবেন।

বর্তমান সময়ের গ্র্যান্ড মুফতি সিস্তানী সাহেবের কাছেও একই ধরণের প্রশ্ন করা হয়েছে। তার মধ্য থেকে কিছু প্রশ্নোত্তর এখানে তুলে ধরার প্রয়াস পাবো ইনশা আল্লাহ। আল্লাহ আমাদের সকলকে ইমামের আযাদারী অনুষ্ঠিত করার ও পালন করার তৌফীক্ব দান করুন এবং তার সুফল আমাদের দান করুন। আর মৃত্যুশয্যা থেকে জান্নাত অবধি ইমাম হোসায়েন (আঃ)-এর শাফায়াত নসীব করুন। আমীন ইয়া রব্বাল আলামীন।

প্রশ্ন: ১- প্রবীণ মোজতাহিদ আক্বায়ে সিস্তানী সাহেব ক্বেবলা! আস্সালামু আলাইকুম ওয়া

রহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু। আল্লাহ আপনাকে উত্তম প্রতিদান ও ছওয়াব প্রদান করুন। আমরা শহীদ সম্রাট ইমাম হোসায়েন (আঃ)-এর 'আরবাঈন' (চল্লিশা) উপলক্ষে কারবালায় যাত্রা করছি, এই উপলক্ষে আমরা বিনীতভাবে অনুরোধ করছি আমাদেরকে পিতার মতো উপদেশ দিন যাতে এই পবিত্র যাত্রার সুফল আরও বেশি হয় এবং পুরস্কার ও প্রতিদান পাই ও আমরা যেন ধন্য হতে পারি। যে বিষয়গুলো আমরা জানি না সেদিকে আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করান। আশা করি আপনার এই পরামর্শ সবার কাজে লাগবে। মহান আল্লাহ আপনার বরকতময় ছায়া চিরকাল আমাদের মাথার উপরে স্থায়ী রাখুন।

ইতি
কতিপয় মোমিন

উত্তর: ১- বিসমিল্লাহির রহমানির রহীম, সমস্ত প্রশংসা বিশ্বজগতের প্রতিপালক আল্লাহর জন্য, আর শান্তি বর্ষিত হোক আমাদের আক্বা ও মাওলা হযরত মোহাম্মাদ মোস্তফা (সঃ) এবং তাঁর পবিত্র বংশধরের প্রতি।

মহান রব্বুল আলামীন এই পবিত্র যিয়ারত পালন করার জন্য যে সকল মোমিনদের সৌভাগ্য দান করেছেন তাদের মনে রাখতে হবে যে, মহান আল্লাহ তাঁর বান্দাদের মধ্যে নবী-রসূলদেরকে মানুষের জন্য দৃষ্টান্ত ও প্রমাণ হিসেবে তৈরি করেছেন যাতে মানুষ তাঁদের শিক্ষা ও চরিত্র অনুসরণ করে হেদায়েতপ্রাপ্ত হতে পারে। আর মহান রব্বুল আলামীন তাঁদের স্মৃতি তাজা ও জীবন্ত করে রাখার জন্য, তাঁদের পবিত্র রওযা জিয়ারত করার জন্য তাগাদা দিয়েছেন, যাতে তাঁদের স্মরণ সর্বদা বজায় থাকে এবং লোকেরা তাঁদের শিক্ষা ও আদেশের প্রতি মনোযোগী হয়ে সর্বশক্তিমান আল্লাহকে স্মরণ করতে পারে। আল্লাহর পথে আত্মোৎসর্গ করার জন্য এবং আল্লাহর আনুগত্য করার ক্ষেত্রে এঁরা সর্বোত্তম দৃষ্টান্ত।

এ কারণে হযরত ইমাম হোসায়েন (আঃ)-এর যিয়ারত যেখানে আমাদেরকে তাঁর অতুলনীয় আত্মত্যাগের কথা স্মরণ করিয়ে দেয় এবং ধর্মীয় শিক্ষা চর্চার আমন্ত্রণ জানায় সেখানে দ্বীনী বিধানের প্রতি আমলরত হতে আহ্বান জানায় এবং উৎসাহিত করে। নামায, হিজাব, আত্মসংশোধন, ক্ষমাশীলতা ও মহানুভবতা, ধৈর্য, সহনশীলতা, আদব-ক্বায়দা, সম্মান জ্ঞাপন, সফরের আদব ইত্যাদির দিকে মনোযোগী করে। বরং সমস্ত ইসলামী শিক্ষা-দীক্ষার দিকে মনোযোগী করায়। সে কারণে এই যিয়ারত আত্ম-গঠন ও উচ্চমানের চারিত্রিক গুণাবলী অর্জন করার মাধ্যম রূপে নেওয়া দরকার যাতে তার প্রভাব পরবর্তী যিয়ারতের জন্য অবশিষ্ট থাকে। সুতরাং এই যিয়ারতে উপস্থিত হওয়ার মানে আইম্মা মাসূমীন (আঃ)-এর মজলিসে ও তাঁদের শিক্ষা-দীক্ষার পাঠ্যক্রমে হাজিরা দেওয়া।

যদিও আমরা ইমামদেরকে প্রত্যক্ষভাবে পাইনি যে, সরাসরি তাঁদের 'দরসে' (পাঠে) হাজিরা দেবো এবং তাঁদের হাত থেকে তরবিয়ত অর্জন করবো। তবে মহান আল্লাহ তাঁদের শিক্ষা ও তাঁদের মতবাদ আমাদের জন্য সংরক্ষণ করেছেন। তাঁদের পবিত্র রওযা যিয়ারত করার জন্য উৎসাহিত করেছেন যাতে সেগুলি আমাদের জন্য আমলের সর্বোত্তম এবং স্পষ্ট উদাহরণ হিসাবে বিবেচিত হয়। এভাবে আমাদের পরীক্ষাও হয়ে যাবে যে, আমরা যারা তাঁদের দরবারে হাজিরা দেওয়ার আকাঙ্খা রাখি তাঁদের শিক্ষা অনুযায়ী আমল করার দাবি তো করি, কিন্তু কতখানি নিজেদের দাবিতে সত্য তা তখন জানা যাবে যখন আমাদের পূর্ববর্তীদের মতো আমাদেরও পরীক্ষা নেওয়া হবে। তবে আমাদের আকাঙ্ক্ষা বাস্তবতার সাথে মিলবে না এ থেকে আল্লাহর আশ্রয় চাওয়া উচিত। এটা ভালোভাবে জেনে রাখা উচিত যে, আমরা যদি ইমামগণ (আঃ) যেভাবে চান সেভাবে জীবনযাপন করি, তাহলে আশা করা যায় যে, আমরা তাঁদের সাথে পুনরুত্থিত হবো যাঁরা তাঁদের সাথে যুদ্ধে শাহাদত বরণ করেছেন। জামালের যুদ্ধের সময় হযরত আলী (আঃ) বলেছিলেন: তারাও এই যুদ্ধে আমার সাথে শরীক রয়েছে যারা এখনো পিতার ঔরসে ও মাতার

গর্ভে অবস্থান করছে। আমাদের মধ্যে যারা তাদের নিয়েতে সত্য তাঁদের শিক্ষার প্রতি আমলরত হওয়া, তাঁদের পদাঙ্ক অনুসরণ করে চলা কঠিন নয়। তাঁদের পবিত্র আত্মা হতে আরও অনেকগুণ বেশি পবিত্রতম, এবং তাঁদের আদব থেকে আদব হাসিল করে নেবে।

আল্লাহর শপথ, আল্লাহর শপথ! নামাযের প্রতি বিশেষ যত্ন নেবে, রেওয়ায়েতে একে (নামাযকে) দ্বীনের স্তম্ভ এবং মোমিনের মেরাজ বলা হয়েছে। যদি এটি গ্রহণ করা হয় তবে অন্যান্য আমল গ্রহণ করা হবে এবং যদি তা প্রত্যাখ্যান করা হয় তবে বাকি আমলগুলিও প্রত্যাখ্যাত হবে। তাই আউওয়াল ওয়াক্তে নামাজের প্রতি খেয়াল রাখা উচিত। আল্লাহর দৃষ্টিতে সবচেয়ে প্রিয় বান্দা সেই, যে তাঁর ডাকে প্রথমে সাড়া দেয়। মোমিনের জন্য এটা ঠিক নয় যে, অন্যের আনুগত্যে নিয়োজিত থাকার কারণে আউওয়ালে ওয়াক্কত নামায পড়া হতে অমনোযোগী হয়ে যাবে। কারণ এটি সব চেয়ে ফযীলতসম্পন্ন এবাদত।

ইমামগণ (আঃ) বলেছেন: যারা নামাযকে হালকা মনে করে, তারা আমাদের সুপারিশ পেয়ে ধন্য হবে না। হযরত ইমাম হোসায়েন (আঃ) আশুরার দিনের মতো সবচেয়ে কঠিন পরিস্থিতিতেও প্রথম ওয়াক্তে নামাজের যত্ন নিয়েছেন এবং বলেছেন: তুমি আমার নামাযের কথা মনে রেখেছো, আল্লাহ তোমাকে নামায আদায়কারীদের মধ্যে গণ্য করুন।

আল্লাহ! আল্লাহ! নিয়ত বিশুদ্ধ রেখো। মানুষের আমলের মূল্য ও বরকত নির্ভর করে তার বিশুদ্ধ নিয়েতের উপর ভিত্তি করে। সর্বশক্তিমান আল্লাহ কেবলমাত্র সেই আমলটি গ্রহণ করবেন যা তাঁর জন্য সম্পূর্ণ বিশুদ্ধ এবং অন্যের কাছ থেকে কোনো কিছুর আশা না করে আঞ্জাম দিয়েছে।

রসূলুল্লাহ (সঃ) যখন মদিনায় হিজরত করছিলেন, তখন তিনি বলেছিলেন: যে ব্যক্তি আল্লাহ ও তাঁর রসূলের জন্য হিজরত করছে, তার হিজরত আল্লাহ ও তাঁর রসূলের দিকে এবং যে ব্যক্তি দুনিয়ার জন্য হিজরত করছে, তার হিজরত দুনিয়ার দিকে। আল্লাহ রব্বুল আলামীন নিয়েতের স্বচ্ছতা অনুযায়ী ছওয়াব বৃদ্ধি করেন। এমনকি সাত শতগুণ বৃদ্ধি করেন। যিয়ারতকারীরা যেন পথিমধ্যে যতটা সম্ভব আল্লাহর যিকির করতে থাকে। প্রত্যেকটি পদক্ষেপে যেন বিশুদ্ধতা বৃদ্ধি পায়। আল্লাহতায়ালা তাঁর বান্দাদেরকে আক্বীদা-বিশ্বাস, কথা ও কাজে আন্তরিকতা ছাড়া আর কোন নেয়ামত দেন নি। সততাবিহীন ও আন্তরিকতা ব্যতিরেকে আঞ্জাম দেওয়া আমল পার্থিব জীবনের সাথে এখানেই থেকে যায়। আর বিশুদ্ধ নিয়েতে ও আন্তরিকতার সাথে আঞ্জাম দেওয়া আমল দুনিয়া ও আখেরাত উভয় জগতে অবশিষ্ট থাকে।

আল্লাহর শপথ! আল্লাহর শপথ! হিজাবের যত্ন নেবেন। কারবালার কঠিনতম পরিস্থিতিতেও আহলে বাইত (সঃ) হিজাবের যত্ন নিয়েছেন, এ বিষয়ে তাঁদের কর্মপদ্ধতি আমাদের জন্য উত্তম আদর্শ। শত্রুদের সেই নিষ্ঠুরতা যা তাঁদেরকে সবচেয়ে বেশি আঘাত করেছিল তা ছিল হিজাব কেড়ে নেওয়া। সকল যিয়ারতকারী বিশেষ করে যিয়ারতকারিণীদের জন্য আবশ্যক যে, তাঁরা যেন সর্বাবস্থায় হিজাবের বিশেষ খেয়াল রাখেন। আর সেই সকল জিনিস থেকে দূরে থাকেন যা হিজাবের পরিপন্থি। যেমন: আঁটসাঁট পোশাক পরা, অনুপযুক্ত জায়গায় পুরুষদের সাথে অবস্থান করা। আর এমনভাবে সাজ-সজ্জা করা যা অনুমোদিত নয়। তাই যতটা সম্ভব হিজাবের যত্ন নেবেন। আর এই পবিত্র যিযারতের সফরে এমন সব জিনিস থেকে দূরে থাকুন যা যিয়ারতের গৌরবের সাথে সামঞ্জস্যশীল নয়।

সর্বশক্তিমান আল্লাহ্‌র দরবারে প্রার্থনা করি যে, আল্লাহ্‌র রসূল (সঃ) ও আহলেবায়ত আল্লাহর পথে যে ক্বুরবানী ও আত্ম-ত্যাগ করেছেন। মানুষের হেদায়েতের জন্য যে কাঠিন্য সহ্য করেছেন তার বিনিময়ে আল্লাহ রব্বুল আলামীন যেন তাঁদেরকে দুনিয়া ও আখেরাতে উত্তম প্রতিদান বৃদ্ধি করেন। আর তাঁদের উপরে যেন সেই রকম বরকত ও শান্তি প্রেরণ করেন যেভাবে তিনি তাঁদের পূর্বের মনোনীত বান্দাদের প্রতি বিশেষ করে হযরত ইব্রাহীম (আঃ)

ও তাঁর পরিবারের উপর রহমত ও শান্তি প্রেরণ করেছিলেন।

আমি সর্বশক্তিমান আল্লাহর কাছে প্রার্থনা করি যে, হযরত ইমাম হোসায়েন (আঃ)-এর যিয়ারতকারীদের জীবনে ও তাঁদের যিয়ারতে বরকত দান করো। তাদের যিয়ারতকে সর্বোত্তমভাবে গ্রহণ করো। যেভাবে তুমি নেক বান্দাদের আমল কবুল করে থাকো। যাতে যিয়ারতের সময় তাঁদের আচার-আচরণ অন্যদের জন্য দৃষ্টান্তমূলক হয়। আহলে বাইতের পক্ষ থেকে তাঁদের মহব্বত ও মোয়াদ্দাতের এবং তাঁদের পদাঙ্ক অনুসরণ করার জন্য সর্বোত্তম পুরস্কার দান করো। তারা যেন ক্বেয়ামতের দিন আহলে বাইত (আঃ)-এর নেতৃত্বে পুনরুত্থিত হয়। এই পথে যারা শহীদ হয়েছেন তারা যেন ইমাম হোসায়েন (আঃ)-এর সাহাবী ও সমর্থকদের অন্তর্ভুক্ত হন। যারা ইমাম হোসায়েন (আঃ)-এর জন্য জীবন উৎসর্গ করেছেন এবং সকল প্রকার অত্যাচার ও দুঃখ-কষ্ট সহ্য করেছেন। নিশ্চিতরূপে আল্লাহ সর্বশক্তিমান এবং প্রার্থনা শ্রবণকারী এবং কবুলকারী। ১৩ সফর, ১৪৩৫ হিজরী।

প্রশ্ন: ২- হযরত ইমাম জাফর সাদিক আলাইহিস সালামের এই রেওয়ায়েতের ব্যাপারে আমাদের বুযুর্গ ও প্রবীণ মোজতাহিগণ কী বলেন? ইমাম জাফর সাদিক্ব (আঃ) বলেছেন: যে ব্যক্তি হযরত ইমাম হোসায়েন (আঃ)-এর জন্য কাঁদে বা কাঁদার ভান করে তার জন্য জান্নাত অবধারিত।

উত্তর: ২- সর্বশক্তিমান আল্লাহর নামে। জী হ্যাঁ, নির্ভরযোগ্য রেওয়ায়েত সহ অন্য অনেক রেওয়ায়েতে যারা হযরত ইমাম হোসায়েন (আঃ)-এর উপর কাঁদে তাদের জন্য জান্নাতের ওয়াদা করা হয়েছে। আর যারা কাঁদার ভাব প্রকাশ করে কিংবা কবিতা পাঠ করার সময় কান্নার ভাব প্রকাশ করে তাদের জন্য জান্নাতের প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়েছে। আর এই জান্নাতের প্রতিশ্রুতিতে অবাক হওয়া উচিত নয়। কেননা শিয়া এবং সুন্নি রেওয়ায়েত অনুযায়ী অনেক ক্ষুদ্রতম কাজের বিনিময়েও জান্নাতের প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়েছে। কিন্তু এর অর্থ এই নয় যে, কেউ যদি তার কর্তব্য ও ওয়াজিবগুলো পরিত্যাগ করতে থাকে এবং হারাম কাজ করতে থাকে তারপরেও সে জাহান্নামের শাস্তি থেকে নিরাপদ থাকবে। কেননা পবিত্র ক্বোরআনের আয়াতে ফরজ পরিত্যাগ ও হারাম কাজ করার জন্য কঠোরতম শাস্তির প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়েছে। এ ধরণের রেওয়ায়েতের অর্থ হলো, এই কর্মগুলো তখন জান্নাতে যাওয়ার কারণ হয় যখন তারা মহান আল্লাহর দরবারে মনোনীত হওয়ার সম্মান পায়। কিন্তু কিছু গুনাহ তাকে জান্নাতে যেতে বাধা দেয়। তখন এই ক্ষুদ্র আমল তাকে বাধা টপকাতে সাহায্য করে। অন্য কথায় বলা যায় যে, জান্নাতে যাওয়ার এই ক্ষুদ্র আমল তাকে জান্নাতের অধিকারী বানিয়ে দেয়। তবে শর্ত হলো এমন কোন আমল যেন না থাকে যা তাকে জাহান্নামের দিকে টেনে নিয়ে যাচ্ছে।

এখন প্রশ্ন উঠতে পারে যে, ইমাম হোসায়েন (আঃ)-এর উপর কান্নার এত ছওয়াব কেন? উত্তরে বলা যেতে পারে যে, কান্না সম্পূর্ণরূপে মানুষের হৃদয়ের সাথে আত্ম-সংযোগ এবং গভীর সম্পর্ক ও সংযুক্তি কারণে মনের অবস্থার বহিঃপ্রকাশ ঘটায়। যা অশ্রু দ্বারা প্রকাশ পায়। এ কারণে ইমাম হোসায়েন (আঃ)-এর প্রতি ক্রন্দন আল্লাহর রসূল (সঃ) ও আহলে বাইতে আত্বহার (সঃ)-এর প্রতি ভালোবাসা ও অনুরাগ প্রকাশ করে। যে লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যের জন্য ইমাম (আঃ) শাহাদাত বরণ করেছিলেন। এটা স্পষ্ট সত্য যে, হযরত ইমাম হোসায়েন (আঃ)-এর বিপ্লব ইতিহাসকে নাড়িয়ে দিয়েছিল, বিদ্রোহীদের সিংহাসন ও মুকুট ধ্বংস করে দিয়েছিল এবং মোমিনদের হৃদয়ে ইসলামী শিক্ষার মূল্যবোধ সম্পূর্ণরূপে প্রতিষ্ঠিত করেছিল। আর এ সবই আহলে বাইতকে আঁকড়ে ধরা এবং তাঁদের স্মৃতিকে জীবন্ত রাখার সুফল। এই ধরণের রেওয়ায়েতগুলি সেই সত্যকেই ব্যক্ত করছে।

কিন্তু 'তাবাকা' অর্থাৎ কান্নার চেষ্টা করা, এর অর্থ অন্যের সামনে কান্না প্রকাশ করা নয়, বরং কান্নার প্রয়োজন অনুভব করে কান্নার চেষ্টা করা। মাঝে মাঝে হৃদয় শুষ্ক হয়ে যায় এবং অনুভূতি ঠান্ডা

হয়ে যায়, তখন আপনাকে আপনার হৃদয়কে নরম করার চেষ্টা করতে হবে, বিবেকের ডাকে লাব্বাইক বলে সাড়া দিতে হবে, যাতে হৃদয় নরম হয়, অনুভূতি প্রভাবিত হয় এবং চোখের পানি বেরিয়ে আসে। অনুরূপ আল্লাহর স্মরণে কাঁদা বা কান্নার চেষ্টা করার জন্য জান্নাতের প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়। বিভিন্ন আলিমগণ এটি উল্লেখ করেছেন, বিশেষ করে জনাব আল্লামা মুকার্রম তাঁর মাক্বতালুল হোসায়েন নামক গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন।

দপ্তরে সিস্তানী ২৯ মহর্রম ১৪৩৫ হিজরী।

প্রশ্ন: ৩- যখন নামাযের সময় হয়, যেমন: যোহরের নামাযের সময় হয়ে গেলে তখন কি মজলিস ও আযাদারী শেষ করতে হবে? নাকি সম্পূর্ণ করা উচিত? আর ভালো কোনটি?

উত্তর: ৩- আগে নামাজ পড়ে নেওয়া উত্তম। আরও অনেক গুরুত্বপূর্ণ হলো আযাদারীর অনুষ্ঠাসূচি এমনভাবে প্রস্তুত করা উচিত যাতে এটি নামাযের সময়ের সাথে সাংঘর্ষিক না হয়।

প্রশ্ন: ৪- খুব ভোরে লোকদের নিয়ে একটি সংক্ষিপ্ত আযাদারীর জুলুস বের করা এবং নামাযের আগে শেষ করা কি উপযুক্ত? অথবা আযাদারদের জন্য অপেক্ষা করা, এই ক্ষেত্রে জুলুস চলাকালীন নামাজের সময় হয়ে যাবে কোনটা করা উচিত?

উত্তর: ৪ প্রচুর সংখ্যা আযাদারের জন্য অপেক্ষা করা ভালো। তবে নামাজের সময় জুলুস বা শোক-মিছিল বন্ধ করা আবশ্যক।

দপ্তরে সীস্তানী ২৯ মহর্রম ১৪৩৫ হিজরী।

প্রশ্ন: ৫- হযরত ইমাম হোসায়েন (আঃ) এবং তাঁর সঙ্গী-সাথীদের শাহাদাতের স্মরণে আমাদের এলাকায় বিপুল সংখ্যক মজলিস অনুষ্ঠিত হয়। মোমিনগণ আহলেবায়তের মহব্বতে অনেক কিছু ব্যয় করেন। এই মসলিসগুলোতে বস্তুগত ও আধ্যাত্মিক উভয় ধরণের সেবা প্রদান করা হয়। এই মজলিসগুলো একই সময়ে বা একটু ব্যবধানে অনুষ্ঠিত হয়। শেষ মজলিসের পরে আহার পরিবেশন করা হয়। এই প্রক্রিয়াটি সকাল ৭টা থেকে দুপুর ১২টা পর্যন্ত চলতে থাকে। আর প্রচুর খাবার আবর্জনায় ফেলে দেওয়া হয়। আপনার দৃষ্টিতে এ কেমন কাজ?

উত্তর: ৫- খাদ্য অপচয় করা শরিয়তের দৃষ্টিতে একটি অবাঞ্ছিত ও হারাম কাজ, এ ধরণের অপচয় রোধে সঠিক পদক্ষেপ গ্রহণ করা প্রয়োজন। জনগণের মধ্যে সহযোগিতা ও বোঝাপড়া বজায় রেখে যতটুকু প্রয়োজন ততটুকুই খাবার তৈরি করতে হবে।

দপ্তরে সিস্তানী ২৯শে মহর্রম ১৪৩৫ হিজরী।

২০ নং পৃষ্ঠার পরবর্তী অংশ

কারণ আল্লাহর নিকট পরিমাণ মানদন্ড নয়, বরং বিশুদ্ধতা, পরিশুদ্ধতা ও আন্তরিক সদিচ্ছাই তাঁর নিকট মানদন্ড। অর্থাৎ মাছির ডানার পরিমাণে হলেও সেই বিন্দু বিন্দু মুক্তির কারণ হয়।

যে শোকে প্রবাহিত এক বিন্দু অশ্রু মুক্তির জামানত নিচ্ছে তা হলো ইমাম হোসায়েন (আঃ)-এর শোক। এই মুক্তির অর্থ এক দিকে, কিন্তু অন্য দিকে সেই মজলুমিয়াত ও অত্যাচার রয়েছে যার কারণে মোমিনদের অন্তর সর্বদা ভারাক্রান্ত থাকে। আল্লাহর লক্ষ-কোটি শুকরিয়া যে, তিনি আমাদের সেই জাতির অন্তর্ভুক্ত করেছেন যে জাতির সৌভাগ্য হলো ইমাম হোসায়েন (আঃ)-এর শোকে দুঃখ-কষ্ট করা। সেই শোক ও দুঃখ, সেই মজলুমিয়াত মোমিনের অন্তরে ক্বেয়ামত অবধি উত্তাপ সৃষ্টি করে এবং হোসায়েনের ওয়ারিশ যুগের ইমাম মাহদী (আঃ)-এর দিবা-রাত্রি রক্তাশ্রু ঝরায়।

এমন কি পৃথিবীর প্রত্যেকটি প্রান্তে মানুষকে ইমাম হোসায়েন (আঃ)-এর শোকে অশ্রু বিসর্জন দিতে দেখা যায়। যে জাতি মুক্তির বার্তা নিয়ে অত্যন্ত স্বল্প সংখ্যা দ্বারা সূচিত হয়েছিল সেই ছোট্ট জাতিটি আজ সারা বিশ্ব চষে কুফুর ও ভ্রষ্টতা পদদলিত করে সারা বিশ্বে মুক্তির প্রাণ সঞ্চার করছে এবং তা প্রতিনিয়তঃ বৃদ্ধি পাচ্ছে।

আমরা মনে করি যে, তা শুধু এক বিন্দু অশ্রু, কিন্তু সেই বিন্দু যদি প্রকাশ পায় তবে তা সামনের সকল বাধা বিপত্তি উপেক্ষা করে নদী সৃষ্টি করে

দেয়। কোনো কবি কতই না সুন্দর বলেছেন: বিন্দু যা সমুদ্রে মিলিত হয় তা সমুদ্র হয়ে যায়।

হে প্রত্যেক বস্তুর উপরে প্রভাবশালী সত্ত্বা! হে সকল সৃষ্টির সৃষ্টিকর্তা! আমাদের তৌফীক্ব দান করো, তুমি তোমার বিশেষ অনুগ্রহ দান করো, এভাবে যে, আমাদের এই অতি স্বল্প পরিমাণ অশ্রু যেন সেই অশ্রুর সাথে মিলিত হয় যা ইমাম হোসায়েন (আঃ)-এর রক্তের প্রতিশোধ গ্রহণকারীর চোখ থেকে অবিরাম বর্ষিত হয়ে সমুদ্র সৃষ্টি করছে।

হে আমার কর্তা! হে আমার মাওলা! হে আমার নির্যাতিত ইমাম, আল্লাহর দরবারে আমাদের দোয়া কবুল হওয়ার সৌভাগ্য দান করো। আমাদেরকে এবং আমাদের ভবিষ্যত প্রজন্মকে তাদের মধ্যে গণ্য করো যারা ইমাম হোসায়েন (আঃ)-এর জন্য কাঁদবে যাতে ক্বেয়ামতের দিন মহানবী (সঃ) ও হযরত ফাতেমা যাহরা (সাঃ)-এর সামনে হাসি-খুশি থাকতে পারি, লজ্জিত না হই। আমীন ইয়া রব্বাল আলামীন।

AL QAEM AL MUNTAZAR, JUL 2022 to DEC 2022, VOL. XXIV, ISSUE NO. 2, RNI NO. 70209/98

হযরত ইমাম জাফর সাদিক্ব (আঃ) বলেছেন:

ক্বেয়ামাতের দিন প্রত্যেই এই কামনা করবে যে, যদি আমি হোসায়েন (আঃ)-এর যায়ের (যিয়ারতকারী) হতাম!!! কেননা ইমাম হোসায়েন (আঃ)-এর যায়েরের আল্লাহর নিকট কত সম্মান ও মর্যাদা সেদিন প্রত্যেকেই প্রত্যক্ষ করবে।

দ্রষ্টব্য: কামিলুয যিয়ারাত, বাব: ৫০, হাদীস নং ১।

www.almuntazar.in

خط و کتابت کا پتہ: ایسوسی ایشن آف امام مہدی علیہ السلام پوسٹ بکس نمبر ۱۹۸۲۲ ممبئی ۴۰۰۰۵۰

Printed, Published and Edited by Syed Mohammed Akbar Rizvi on behalf of Association of Imam Mahdi (A.S.), Published from 97/C, Bazar Road, Bandra (W), Mumbai 400050, and Printed at Gazelle Enterprise Offset Printing & Packaging, 504/A-Sussex Industrial Estate, D.K. Cross Road, Byculla, Mumbai 400 027 (M.S.)